পাঠ সঞ্চয়



Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VI
Vide Notification No. TB/74/VI/TB/160
and also Board's Letter No. 10367/G Dated 24.11.75.

পাঠ-সঞ্চয়

[ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য]

পরিমার্জিত সংস্করণ

শ্রীকান্তিময় ঘোষ এম.এ., বি.টি., ডিপ্-ইন্-ই. এল.টি.
প্রধান শিক্ষক
বাগবাজার হাই স্কুল, কলিকাতা-৩
প্রাক্তন সহকারী প্রধান শিক্ষক, শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল

ও

এ. কে. ঘোষ, এম. কম., বি.টি.
প্রধান শিক্ষক
চিত্তরঞ্জন কলোনী হিন্দু বিদ্যাপীঠ
কলিকাতা-৫৯

চক্রবর্তী এণ্ড কোং
৮/সি, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
পি. চক্রবর্তী
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ—১৯৭৮
দ্বিতীয় „ —১৯৮১
তৃতীয় „ —১৯৮২

মূল্য—তিন টাকা আশি পয়সা

মুদ্রাকর :
শ্রীঅমিতকুমার সাউ
নিউ [illegible] প্রেস
৭৭, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ



পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

—শিবনাথ শাস্ত্রী

[**লেখক-পরিচিতি**—১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার মাতুলালয় চিংড়িপোতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃনিবাস ২৪ পরগণা জেলার মজিলপুর। তিনি ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে সংস্কৃতে এম. এ. পাশ করিয়া শাস্ত্রী উপাধি পান। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কারক ও নেতা ছিলেন এবং বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।]

বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮২০ সালে মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতি বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গোঘাট নিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত ঠাকুরদাসের বিবাহ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ইঁহাদের প্রথম সন্তান।

বিদ্যাসাগর শৈশবে কিয়ৎকাল গ্রাম্য পাঠশালাতে পড়িয়া পিতার সহিত কলিকাতাতে আসেন। কলিকাতাতে আসিয়া তাঁহার পিতার

মনিব বড়বাজারের ভগবতচরণ সিংহের ভবনে পিতার সহিত বাস করিতে আরম্ভ করেন। পিতাপুত্রে রন্ধন করিয়া খাইতেন। অতি কষ্টে দিন যাইত, এই সময়ে ভগবতচরণ সিংহের কনিষ্ঠা কন্যা রাইমণি তাঁহাকে পুত্রাধিক যত্ন করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোমল হৃদয় কোনও দিন সে উপকার বিস্মৃত হয় নাই। বৃদ্ধ বয়সেও রাইমণির কথা বলিতে দর দর ধারে তাঁহার চক্ষে জলধারা বহিত।

কলিকাতাতে আসিয়া কয়েক মাস পড়িবার পর, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা তাঁহাকে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে ভর্তি করিয়া দেন। কালেজে পদার্পণ করিবামাত্র তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা শিক্ষক ও ছাত্র সকলের গোচর হইল। ১৮২৯ সালের জুন মাসে তিনি ভর্তি হইলেন। ছয় মাসের মধ্যেই মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। সেই বৃত্তি সহায় করিয়া তিনি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে কালেজের সমুদয় উচ্চ বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করিলেন।

১৮৪১ সালে তিনি কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর উপাধি পাইয়া ফোর্ট উইলিয়াম কালেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি বাড়িতে বসিয়া ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সকলে সংস্কৃত পণ্ডিত বলিয়াই জানেন। কিন্তু তিনি ইংরাজীতে কিরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন, কি সুন্দর ইংরাজী লিখিতে পারিতেন, তাহা অনেকে জানেন না।

১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কালেজের এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর পদ শূন্য হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ পদ পাইলেন, কিন্তু উক্ত কালেজের অধ্যক্ষ রসময় দত্ত মহাশয়ের সহিত মতভেদ হওয়াতে দুই এক বৎসরের মধ্যে ঐ পদ পরিত্যাগ করিতে হইল। ১৮৫০ সালের প্রারম্ভে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ফোর্ট উইলিয়াম কালেজের কেরাণীগিরি ত্যাগ করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করাতে, মার্শাল সাহেবের অনুরোধে মাসিক ৮০ টাকা বেতনে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ কর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সে পদে তাঁহাকে অধিক দিন থাকিতে হয় নাই। ঐ

সালেই সংস্কৃত কালেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদ শূন্য হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ পদ গ্রহণ করিলেন। সেই পদ হইতে ১৮৫১ সালের জানুয়ারী মাসে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন।

অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি নানা প্রকার সংস্কার কার্যে হস্তার্পণ করেন। সংস্কৃত কালেজের শিক্ষাপ্রনালীর মধ্যে এই সকল পরিবর্তন করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে কত চিন্তা ও কত শ্রম করিতে হইয়াছিল তাহা আমরা এখন কল্পনা করিতে পারিব না।

ইহার পর দিন দিন তাঁহার পদবৃদ্ধি ও খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। ১৮৪৭ সালে তাঁহার 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। তৎপরে ১৮৪৮ সালে 'বাঙ্গালার ইতিহাস', ১৮৫০ সালে 'জীবনচরিত', ১৮৫১ সালে বোধোদয়' ও 'উপক্রমণিকা', ১৮৫৫ সালে 'শকুন্তলা' ও 'বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব, প্রকাশিত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের নিকট পরিচিত হইল।

শিক্ষাবিভাগের ইনস্পেকটারের পদ সৃষ্টি হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদের উপরে নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের ইন্‌স্পেকটারের পদ প্রাপ্ত হন। এক দিকে যখন তাঁহার পদ ও শ্রম বাড়িল, তখন অপর দিকে তিনি এক মহাব্রতে আত্মসমর্পণ করিলেন। সেই সালেই বিধবা-বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থ প্রচার করিলেন। বঙ্গদেশে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সমাজ সংস্কারে এই তাঁহার প্রথম হস্তক্ষেপ নয়। ১৮৪৯ সালে মে মাসে বেথুন সাহেব যখন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি ও তাঁহার বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার বেথুনের পৃষ্ঠপোষক হইয়া দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন কার্যে আপনাদের দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করেন।

১৮৫৬ সাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল। এই বৎসর তাঁহার কার্যপটুতা যে কত তাহা জানিতে পারা গেল।

১৮৫৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার অন্যতম বন্ধু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এক বিধবার পাণিগ্রহণ করিলেন। তাহাতে বঙ্গদেশে যে আন্দোলন উঠিল, তাহার অনুরূপ জাতীয় উত্তেজনা আমরা অল্পই দেখিয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রীয় বিচারে সন্তুষ্ট না থাকিয়া যখন কার্যতঃ বিধবা-বিবাহ প্রচলনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন আপামর সাধারণ সকল লোকে একেবারে জাগিয়া উঠিল। পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, মহিলাগোষ্ঠিতে এই কথা চলিল। শান্তিপুরের তাঁতীরা "বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে"—এই গানাঙ্কিত কাপড় বাহির করিল। এমন কি বিদ্যাসাগরের প্রাণের উপরেও লোকে হাত দিবে এরূপ আশঙ্কা বন্ধুবান্ধবের মনে উপস্থিত হইল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুর এই কয় জেলার স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হইলেই, নানা স্থানে বালকদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মিস্টার গর্ডন ইয়ং সাহেব বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য গভর্ণমেণ্টের অর্থ ব্যয় করিতে অস্বীকৃত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেরিত বিল স্বাক্ষর করিলেন না। কথায় কথায় মতভেদ ও বিবাদ হইতে লাগিল। কর্তৃপক্ষের বিবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও এই বিবাদের মীমাংসা না হওয়ায় তাঁহাকে কর্ম পরিত্যাগ করিতে হইল। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে জুলাই তাঁহার মৃত্যু হয়।

আমি নানা স্থলে নানা অবস্থাতে তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া তাঁহার প্রকৃতির গুণ সকল দেখিবার যথেষ্ট অবসর পাইতাম। এরূপ দয়াবান, মহাশয়, তেজীয়ান, উগ্র উৎকট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ এ জীবনে অতি অল্পই দেখিয়াছি।

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাল্যকাল সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। "১৮৫৬ সাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল"—সর্বশ্রেষ্ঠ কাল কেন ?

৩। অর্থ লিখ—

অন্তঃপাতী, শিক্ষাপ্রণালী, কার্যপটুতা, সমাজ সংস্কার, শাস্ত্রীয়।

৪। ব্যাখ্যা লিখ—

"এরূপ দয়াবান, মহাশয়, তেজীয়ান, উগ্র উৎকট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ এ জীবনে অতি অল্পই দেখিয়াছি।"

৫। বাক্য রচনা কর—

অধ্যয়ন, মতভেদ, সংস্কার, পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে।

৬। সন্ধি বিচ্ছেদ কর—

পুত্রাধিক, সাহিত্যাধাপক, হস্তার্পণ, শাস্ত্রানুমোদিত, গানাঙ্কিত।

৭। টীকা লিখ—ফোর্ট উইলিয়াম কালেজ, বোধোদয়, বিধবা-বিবাহ, শান্তিপুরের তাঁতী, ইন্‌স্পেকটার।

৮। পদ পরিবর্তন কর—দরিদ্র, গ্রাম্য, কোমল, অভিজ্ঞ, প্রবল।

বিষয় — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। তাঁর কর্মজীবনের সাফল্য ও সমাজসংস্কারের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখিত।

মূল্যায়ন — মহৎ জীবনের মহান কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় — সার্থক



ঝান্সীর রাণী

—সখারাম গণেশ দেউস্কর

[লেখক-পরিচিতি—সখারাম গণেশ দেউস্কর ছিলেন মারাঠী ব্রাহ্মণ। জাতিতে মারাঠী হইলেও তিনি বাঙালীকে ও বাংলা সাহিত্যকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সখারাম এক সময়ে বিখ্যাত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'দেশের কথা', 'তিলকের মোকদ্দমা', 'ঝান্সীর রাজকুমার' 'মহামতি রাণাড়ে' প্রভৃতি বহু পুস্তক প্রণয়ণ করেন। এইরূপ গ্রন্থ-প্রচারের মধ্যে লেখকের স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।]

ইংরাজ সেনানী স্যার হিউরোজ উত্তর ভারতের নানা স্থানের বিদ্রোহ দমন করিয়া ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ২০শে মার্চ প্রাতঃকালে ঝান্সীর উপকণ্ঠভাগে উপস্থিত হইলেন। কথিত আছে তিনি রাণী মহোদয়াকে স্বজনবর্গসহ নিরস্ত্রভাবে ইংরাজদের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তেজস্বিনী রাণী লক্ষ্মীবাঈ এরূপ হীনতা স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ একরাত্রির মধ্যে দুর্গরক্ষার সমুদয় আয়োজন করিলেন। তিনি দুর্গপ্রাকারে মঞ্চ নির্মাণ করাইয়া তদুপরি স্বনাম-প্রসিদ্ধ কামানসকল স্থাপনপূর্বক ইংরাজের উপর অগ্নিবর্ষণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

২৩শে মার্চ হইতে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত ১১ দিন ইংরাজেরা ঝান্সী অবরোধ করিয়া রাণীর সৈন্যের সহিত অহোরাত্র যুদ্ধ করিল। কিন্তু লক্ষ্মীবাঈয়ের অসাধারণ সাহস ও অধ্যবসায়-গুণে তাহাদিগের দুর্গাধিকারের সকল চেষ্টাই বিফল হইল। লক্ষ্মীবাঈয়ের সহায়তাকল্পে নানা সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ সেনানী তাঁতিয়া টোপে বিংশতিসহস্র সৈন্যসহ কালপী হইতে ঝান্সীর সমীপবর্তী হইয়াছিলেন। ইংরাজেরা তাঁহাকে বাধাদানের জন্য অগ্রসর হইলে উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে তাঁতিয়া টোপের পরাজয় ঘটে। তাঁহার সৈন্যগণ সমস্ত যুদ্ধসামগ্রী সমরক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। ইংরাজেরা অনায়াসে সেই সকল সামগ্রী লাভ করিয়া নূতন বল সঞ্চয় করিল।

ঝান্সীর সৈন্যদিগের অসাধারণ বিক্রমে ইংরেজেরা পুনঃপুনঃ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। এমন সময় দুলাজী ঠাকুর নামক রাণীর জনৈক বুন্দেলা সর্দার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দুর্গের দক্ষিণদ্বার ইংরাজ সৈন্যকে ছাড়িয়া দিল। গোরা সৈন্য প্রবল সাগর প্রবাহের ন্যায় সবেগে নগরে প্রবেশ করিয়া নিরীহ নগরবাসীদিগের যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহাকেই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতে লাগিল।

ইংরেজরা ঝান্সীর দুর্গ অধিকার করিলে রাণী লক্ষ্মীবাঈ আত্ম-রক্ষার জন্য পুরুষোচিত যোদ্ধবেশে অশ্বারোহণে নগর ত্যাগ করিলেন। রাজধানী পরিত্যাগকালে রাণী শিশুপুত্র দামোদর রাওকে একখানি বহুমূল্য শালের দ্বারা স্বীয় পৃষ্ঠদেশে বন্ধন করিয়া লইয়াছিলেন। তদবধি সেই রাজকুমারকে প্রায় আড়াই মাস পর্যন্ত অধিকাংশ সময় জননীর পৃষ্ঠদেশেই অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল।

ঝান্সী ত্যাগের পর রাণী মহোদয়া কালপীতে গিয়া বিদ্রোহী

সিপাহীদিগের সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর তিনি অসীম শৌর্য প্রকাশ করিয়া গোয়ালিয়র নগর ও দুর্গ অধিকার করেন। তাঁহার অসাধারণ শক্তিগুণে সমগ্র মধ্যভারত দুই তিন মাস পর্যন্ত ইংরাজের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইংরাজেরা গোয়ালিয়র উদ্ধার করিবার জন্য যে যুদ্ধ করে, তাহাতেই এই বীর মহিলার আলোকসামান্য সমরনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছিল।

১৮ই জুনের ভয়াবহ যুদ্ধে বিদ্রোহী সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়নপর হইলে, রাণী স্বল্পসংখ্যক অনুচরসহ গোয়ালিয়র সমরক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলেন। কতিপয় ইংরাজ সৈনিক তাঁহার অনুসরণ করিল। আত্মরক্ষার আশা বিলীনপ্রায় হওয়ায় রাণী রামচন্দ্র রাও দেশমুখ নামক একজন বিশ্বস্ত সর্দারের প্রতি স্বীয় প্রিয়তম পুত্রের রক্ষণভার অর্পণ করিয়াছিলেন। কিছুদূর গমনের পর তিনি একদল ইংরাজ সৈনিকের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। তখন উভয়পক্ষে যে যুদ্ধ বাধিল, তাহাতে একজন শ্বেতাঙ্গ সৈনিক লক্ষ্মীবাঈয়ের শীর্ষদেশে অস্ত্রাঘাত ও বক্ষে সঙ্গীন বিদ্ধ করিল। সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াও বীর রমণী অতুল বিক্রমে আততায়ীর প্রাণবধ করিলেন। শত্রুপক্ষীয় সৈনিকের ভীষণ আঘাতে কাতর অবস্থায় রামচন্দ্র রাও তাঁহাকে নিকটবর্তী এক পর্ণ কুটীরে লইয়া গেলেন। তখন পিপাসায় রাণীর কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছিল। কুটিরস্বামী গঙ্গাদাস বাবাজী তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে গঙ্গাজল পান করাইলেন। সুশীতল গঙ্গোদকপানে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া রাণী স্নেহপূর্ণ নয়নে দামোদরের প্রতি একবার সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার নেত্রদ্বয় চিরকালের জন্য দীপ্তিহীন হইল।

অনুশীলনী

১। সিপাহী-সংগ্রামের সঙ্গে লক্ষ্মীবাঈয়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের কিরূপ সংযোগ ছিল?

২। ইংরাজ সরকারের সহিত লক্ষ্মীবাঈয়ের যুদ্ধ বাধিবার কারণ কি ?

৩। সিপাহী-সংগ্রামে দেশাত্মবোধের কি পরিচয় পাওয়া যায় ?

৪। ঝান্সীর যুদ্ধে পরাজয়ের প্রধান কারণ কি কি ?

৫। অর্থ লিখ—উপকণ্ঠভাগে, স্বনামপ্রসিদ্ধ, অধ্যবসায়, আলোকসামান্য, দীপ্তিহীন।

৬। ব্যাখ্যা লিখ—

(ক) কিন্তু তেজস্বিনী রাণী……সম্মত হইলেন না।

(খ) সুশীতল গঙ্গোদকপানে……দীপ্তিহীন হইল।

৭। টীকা লিখ—হিউ রোজ, তাঁতিয়া টোপে, দামোদর রাও।

৮। যে অংশটি ঠিক নহে তাহা কাটিয়া দাও :

(ক) ইংরাজ সৈন্য সহজে/অতি কষ্টে ঝান্সী অধিকার করিয়াছিল।

(খ) কতিপয় ভারতীয় সৈন্য/ইংরাজ সৈন্য রাণীকে আক্রমণ করিল।

৯। সন্ধি বিচ্ছেদ কর—অহোরাত্র, তদবধি, ভয়াবহ, অধিকাংশ, গঙ্গোদক।

১০। লিঙ্গ পরিবর্তন কর—রাণী, তেজস্বিনী, পুত্র, জননী, প্রিয়তম।

১১। বাক্য রচনা কর—শুষ্ক, বিদ্রোহী, অর্পণ, আক্রান্ত, দৃষ্টিপাত।

১২। পদ নির্ণয় কর—সেনানী, তেজস্বিনা, নিষ্ঠুরভাবে, স্বীয়, নেত্রদয়।

বিষয় — ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের — অনন্যসাধারণ বীরত্বের ও নেতৃত্বের — কাহিনী সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় আলোচিত।

মূল্যায়ন — দেশাত্মবোধের প্রেরণা।



উদ্ভিদের প্রাণ

—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

[**লেখক-পরিচিতি**—১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর আচার্য জগদীশ-চন্দ্রের জন্ম হয়। পৈতৃক গৃহ ঢাকা বিক্রমপুরের রাড়িখালে। পিতা ভগবান চন্দ্র বসু। জগদীশচন্দ্র পদার্থ ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানে মূল্যবান গবেষণা করিয়া শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। 'উদ্ভিদের প্রাণ' এই অংশ তাঁহার রচিত 'অব্যক্ত' হইতে গৃহীত। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।]

গাছেরা কি কিছু বলে? অনেকে বলিবেন, এ আবার কেমন প্রশ্ন? গাছ কি কোনও দিন কথা কহিয়া থাকে? মানুষেই কি সব কথা ফুটিয়া বলে? আর যাহা ফুটিয়া বলে না, তাহা কি কথা নয়? আমাদের একটি খোকা আছে, সে সব কথা ফুটিয়া বলিতে পারে না, আবার ফুটিয়া যে দুই চারিটি কথা বলে, তাহাও এমন আধ-আধ ভাঙা-ভাঙা যে, অপরের সাধ্য নাই তাহার অর্থ বুঝিতে পারে। কিন্তু

আমরা আমাদের খোকার সকল কথার অর্থ বুঝিতে পারি। কেবল তাহা নয়, আমাদের খোকা অনেক কথা ফুটিয়া বলে না, চোখ-মুখ ও হাত-নাড়া প্রভৃতির দ্বারা আকার ইঙ্গিতে অনেক কথা কয়, আমরা তাহা বুঝিতে পারি, অন্যে বুঝিতে পারে না!

একদিন পার্শ্বের বাড়ি হইতে একটি পায়রা উড়িয়া আসিয়া আমাদের বাড়িতে বসিল, বসিয়া গলা ফুলাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। পায়রার সঙ্গে খোকার নূতন পরিচয়, খোকা তাহার অনুকরণে ডাকিতে আরম্ভ করিল, পায়রা কি রকম ভাবে ডাকে ?—বলিলেই ডাকিয়া দেখায় ; তদ্ভিন্ন সুখে-দুঃখে, চলিতে-বসিতে আপনার মনেও ডাকে। নূতন বিদ্যাটা শিখিয়া তাহার আনন্দের সীমা নাই।

একদিন বাড়ি আসিয়া দেখি, খোকার বড় জ্বর হইয়াছে, মাথার যন্ত্রণায় চক্ষু মুদিয়া বিছানায় পড়িয়া আছে। যে দুরন্ত শিশু সমস্ত দিন বাড়ি অস্থির করিয়া তুলিত সে আজ একবার চক্ষু খুলিয়াও চাহিতেছে না। আমি তাহার বিছানার পাশে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম ; আমার হাতের স্পর্শে খোকা আমাকে চিনিল এবং অতি কষ্টে চক্ষু খুলিয়া আমার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর পায়রার ডাক ডাকিল। ঐ ডাকের ভিতর আমি অনেক কথা শুনিলাম। আমি বুঝিতে পারিলাম, খোকা বলিতেছে, "খোকাকে দেখিতে আসিয়াছ ? খোকা তোমাকে বড় ভালবাসে।" আরও অনেক কথা বুঝিলাম, যাহা আমি কোন কথার দ্বারা বুঝাইতে পারি না।

যদি বল, পায়রার ডাকের ভিতর এত কথা কি করিয়া শুনিলে ? তাহার উত্তর এই—খোকাকে ভালবাসি বলিয়া। তোমরা দেখিয়াছ ছেলের মুখ দেখিয়া মা বুঝিতে পারেন ছেলে কি চায় ? অনেক সময় কথার আবশ্যক হয় না। ভালবাসিয়া দেখিলে অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

আগে যখন একা মাঠে কিংবা পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম তখন সব খালি-খালি লাগিত। তারপর গাছ, পাখী, কীটপতঙ্গদিগকে ভালবাসিতে শিখিয়াছি। সে অবধি তাহাদের অনেক কথা বুঝিতে পারি, আগে তাহা পারিতাম না। এই যে গাছগুলি কোন কথা বলে না, ইহাদের যে একটা জীবন আছে, আমাদের মত আহার করে, দিন দিন বাড়ে, আগে এসব কিছুই জানিতাম না, এখন বুঝিতে পারিতেছি। এখন ইহাদের মধ্যেও আমাদের মত অভাব দুঃখ-কষ্ট দেখিতে পাই। জীবন ধারণ করিবার জন্য ইহাদিগকেও সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। কষ্টে পড়িয়া ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ চুরি ডাকাতি করে। মানুষের মধ্যে যেরূপ সদগুণ আছে, ইহাদের মধ্যেও তাহার কিছু কিছু দেখা যায়। বৃক্ষদের মধ্যে একে অন্যকে সাহায্য করিতে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে একের সহিত অপরের বন্ধুতা হয়। তারপর মানুষের সর্বোচ্চ গুণ স্বার্থত্যাগ—গাছে তাহাও দেখা যায়। মা নিজের জীবন দিয়া সন্তানের জীবনরক্ষা করেন। সন্তানের জন্য নিজের জীবনদান উদ্ভিদেও সচরাচর দেখা যায়। গাছের জীবন মানুষের জীবনের ছায়া মাত্র। ক্রমে এসব কথা তোমাদিগকে বলিব।

তোমরা শুষ্ক গাছের ডাল সকলেই দেখিয়াছ। মনে কর কোন গাছের তলাতে বসিয়া আছ। ঘন সবুজ পাতায় গাছটি ঢাকা, ছায়াতে তুমি বসিয়া আছ। গাছের নীচে এক পার্শ্বে একখানি শুষ্ক ডাল পড়িয়া আছে। এক সময় এই ডালে কত পাতা ছিল, এখন সব শুকাইয়া গিয়াছে, আর ডালের গোড়ায় উই ধরিয়া গিয়াছে। আর কিছুকাল পরে ইহার চিহ্ন থাকিবে না। আচ্ছা বল ত—এই গাছ, আর এই মরা ডালে কি প্রভেদ? গাছটি বাড়িতেছে; আর অন্যটিতে জীবন নাই। যাহা জীবিত, তাহা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। জীবিতের আর একটি লক্ষণ এই যে, তাহার গতি আছে, অর্থাৎ তাহা নড়ে চড়ে। গাছের গতি হঠাৎ দেখা যায় না। লতা কেমন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাছকে জড়াইয়া ধরে, দেখিয়াছ?

জীবিত বস্তুতে গতি দেখা যায়, জীবিত বস্তু বাড়িয়া থাকে। কেবল ডিমে জীবনের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ডিমে জীবন ঘুমাইয়া থাকে। উত্তাপ পাইলে ডিম হইতে পাখীর ছানা জন্মলাভ করে। বীজগুলি যেন গাছের ডিম। বীজের মধ্যেও এরূপ গাছের শিশু ঘুমাইয়া থাকে। মাটির উত্তাপ ও জল পাইলে বীজ হইতে বৃক্ষ-শিশুর জন্ম হয়।

বীজের ওপর এক কঠিন ঢাকনা, তাহার মধ্যে বৃক্ষ-শিশু নিরাপদে নিদ্রা যায়। বীজের আকার নানা প্রকার—কোনটি অতি ছোট, কোনটি বড়। বীজ দেখিয়া গাছ কত বড় হইবে বলা যায় না। অতি প্রকাণ্ড বট গাছ সরিষা অপেক্ষা ছোট বীজ হইতে জন্মে। কে মনে করিতে পারে, এত বড় গাছটা এই ক্ষুদ্র সরিষার মধ্যে লুকাইয়া আছে? তোমরা হয়ত কৃষকদিগকে ধান্যের বীজ ক্ষেত্রে ছড়াইতে দেখিয়াছ। কিন্তু যত গাছ-পালা, বন-জঙ্গল দেখ, তাহার অনেকের বীজ মানুষ ছড়ায় নাই। নানা উপায়ে গাছের বীজ ছড়াইয়া যায়। পাখীরা ফল খাইয়া দূর-দেশে বীজ লইয়া যায়। এই প্রকারে জন-মানবশূন্য দ্বীপে গাছ জন্মিয়া থাকে। ইহা ছাড়া অনেক বীজ বাতাসে উড়িয়া অনেক দূর দেশে ছড়াইয়া পড়ে। শিমূল গাছ অনেকে দেখিয়াছ। শিমূল ফল যখন রৌদ্রে ফাটিয়া যায়, তখন তাহার মধ্য হইতে বীজ তূলার সঙ্গে উড়িতে থাকে। ছেলেবেলায় আমরা এই সকল বীজ ধরিবার জন্য ছুটিতাম। হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলেই বাতাস তূলার সহিত বীজকে অনেক উপরে লইয়া যাইত। এই প্রকারে দিন রাত্রি দেশদেশান্তরে বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রত্যেক বীজ হইতে গাছ জন্মে কি না, কেহ বলিতে পারে না। হয়ত কঠিন পাথরের উপর বীজ পড়িল, সেখানে আর অঙ্কুর বাহির হইতে পারিল না। অঙ্কুর বাহির হইবার জন্য উত্তাপ, জল ও মাটি চাই।

যেখানে বীজ পড়ুক না কেন, বৃক্ষ-শিশু অনেক দিন পর্যন্ত বীজের

মধ্যে নিরাপদে ঘুমাইয়া থাকে। বাড়িবার উপযুক্ত স্থানে যতদিন না পড়ে, ততদিন বাহিরের কঠিন ঢাকনা গাছের শিশুটিকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করে।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বীজ পাকিয়া থাকে। আম-লিচুর বীজ বৈশাখ মাসে পাকে। ধান, যব ইত্যাদি আশ্বিন-কার্তিক মাসে পাকিয়া থাকে। মনে কর, একটি গাছের বীজ আশ্বিন মাসে পাকিয়াছে। আশ্বিন মাসের শেষে ঝড় হয়। ঝড়ে পাতা ও ছোট ছোট ডাল ছিড়িয়া চারিদিকে পড়িতে থাকে। এইরূপে বীজগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। প্রবল বাতাসের বেগে কোথায় উড়িয়া যায়, কে বলিতে পারে? মনে কর, একটি বীজ সমস্ত রাত্রি মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে একখানা ভাঙা ইট কিংবা মাটির ডেলার নীচে আশ্রয় লইল। কোথায় ছিল, কোথায় আসিয়া পড়িল। ক্রমে ধূলা ও মাটিতে বীজটি ঢাকা পড়িল; এখন বীজটি মানুষের চক্ষুর আড়াল হইল। আমাদের দৃষ্টি হইতে দূরে গেল বটে, কিন্তু বিধাতার দৃষ্টির বাহিরে যায় নাই। পৃথিবী মাতার ন্যায় তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। বৃক্ষ-শিশুটি মাটিতে ঢাকা পড়িয়া বাহিরের শীত ও ঝড় হইতে রক্ষা পাইল। এইরূপে নিরাপদে বৃক্ষ-শিশুটি ঘুমাইয়া রহিল

অনুশীলনী

১। বৃক্ষ-শিশু কোথায় থাকে? কেমন করিয়া বীজের বিস্তার হয়?

২। গাছেরা যে সজীব পদার্থ তাহা কেমন করিয়া বোঝা যায়? সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৩। ব্যাখ্যা লিখ—(ক) "ডিমে জীবন ঘুমাইয়া থাকে।"

(খ) "এইরূপ বৃক্ষ-শিশুটি ঘুমাইয়া রহিল।"

৪। অর্থ লিখ—ঢাকনা, জনমানবশূন্য, অঙ্কুর, নিরাপদ, আড়াল।

৫। বাক্য রচনা কর—গতি, কঠিন, অঙ্কুর, আধ-আধ, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা।

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর—

(ক) মানুষেরই কি — কথা ফুটিয়া বলে।

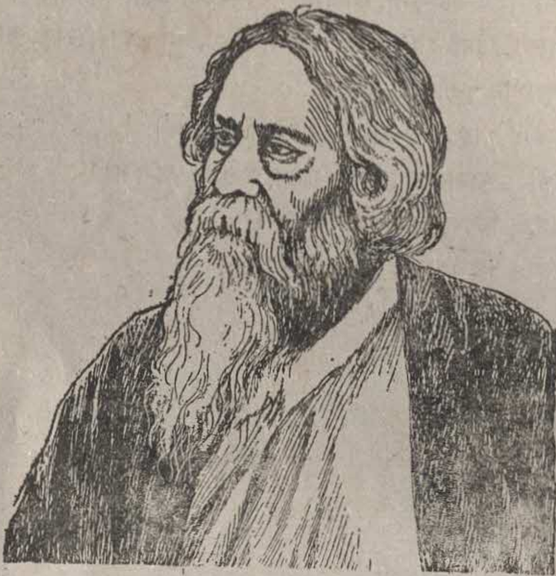
(খ) আমাদের খোকা অনেক কথা — বলে না।

(গ) ডিমে — ঘুমাইয়া থাকে।

(ঘ) বৃক্ষ-শিশু — নিদ্রা যায়।

বিষয় : বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। গাছের যে সজীব সত্তা— তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। কীভাবে বীজের দ্বারা— বৃক্ষশিশু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে তাহারও আলোচনা—করা হইয়াছে।

মূল্যায়ন — সহজ ও সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচনায় জানিবার আগ্রহ-সঞ্চারিত করাই লেখকের উদ্দেশ্য।



দার্জিলিং যাত্রা

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক-পরিচিতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জন্ম ৭ই মে, ১৮৬১, মৃত্যু ৭ই আগস্ট, ১৯৪১। নিবাস জোড়াসাঁকো, কলিকাতা ও পরে শান্তিনিকেতন, বীরভূম। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন রায়ের বন্ধু প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, শিক্ষা, ভ্রমণ কাহিনী প্রভৃতি বহু বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত "জনগণমন অধিনায়ক" গানটি তাঁহারই রচিত।]

যখন তিনটার সময় শেয়ালদহে দার্জিলিংএর গাড়িতে উঠিলাম তখন আমার মনে বড়ো আনন্দের উদয় হইল। উঁচু জায়গার মধ্যে

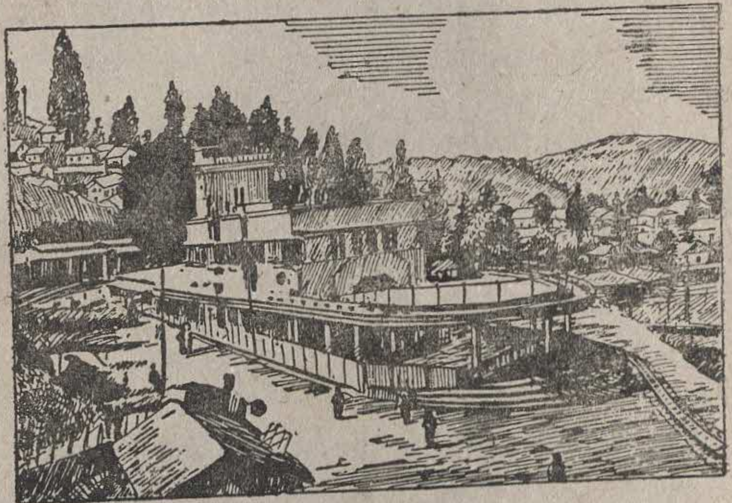
মানিকতলার খাল কাটার সময় মাটি জমা হইয়াছিল তাহাই দেখিয়াছি; আর অত্যন্ত মোটা রামশঙ্কর কামারকে পাড়ার লোকেরা পর্বত বলিয়া থাকে, তাহাকেও দেখিয়াছি, ইহা হইতেই হিমালয়ের ভাব যতটা পাওয়া যায় তাহা পাওয়া গিয়াছে,—কিন্তু এবার স্বয়ং হিমালয়ে সশরীরে যাইতেছি, হিমালয় পর্বত স্বচক্ষে দেখিব, একথা যতই মনে হইতে লাগিল, আনন্দে আমার বক্ষঃস্থল ততই হিমালয় অপেক্ষা ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

সন্ধ্যা সাতটার সময় দামুকাদিয়া স্টেশনে পৌঁছিলাম। দার্জিলিং যাত্রীদের এই স্টেশনে নামিতে হয় এবং পদ্মানদী পার হইয়া অন্য এক ট্রেনে চড়িতে হয়। বলা বাহুল্য, তখন সারার পুল হয় নাই। আমরা যখন এখানে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। জাহাজে উঠিলাম। নদী পার হইতে পনের মিনিটের কিছু বেশী লাগে। পার হইয়া দেখি যে, সারাঘাট স্টেশনে অন্য এক ট্রেন প্রস্তুত আছে। তাহাতে উঠিয়া পড়িলাম। এখানকার গাড়িগুলি ছোট ছোট। ট্রেনের ঝাঁকানিতে আমার নিদ্রাবেশ হয়, সুতরাং রাত্রিটি বেশ কাটিয়া গেল। ভোর ৬টার কিছু পূর্বে স্টেশনে গাড়ি থামিল। আমরা চা পান করিয়া লইলাম। এক ঘণ্টা পরে শিলিগুড়ি স্টেশনে গাড়ি থামিল। এইস্থান হইতে কলের ট্রাম-গাড়িতে চড়িয়া পাহাড়ে উঠিতে হয়। এস্থানে দিব্যি আহারের স্থান আছে। ট্রামগাড়ি প্রস্তুত আছে, তাহাতে চড়িলাম। এইস্থানে ট্রাম-গাড়িগুলি নূতন ধরনের, খান আঠার গাড়ির মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িগুলি চতুর্দিক শার্সিদ্বারা ঘেরা, বাকি কতকটা চিৎপুর-রোডের ট্রামগাড়ির মত ফাঁকা। এই ফাঁকা গাড়িতে চড়িতে চারি-দিকের দৃশ্য বেশ ভাল দেখা যায়, সুতরাং আমরা তাহাতেই বসিলাম।

শিলিগুড়ি পৌঁছিয়া যাত্রীদের গরম কাপড় পরিতে হয়। আমি কাপড় ছাড়িলাম। ট্রামগাড়ি ছাড়িল। চারদিকে ধানের ক্ষেত্র, মধ্যে মধ্যে চা-ক্ষেত্রের সুন্দর শোভা দেখিতে দেখিতে গাড়ি

পাহাড়ের নীচে আসিল। এইবার পাহাড়ের উপর উঠিতে আরম্ভ করা গেল। ঘন এক শালবনের মধ্য দিয়া গাড়ি চলিয়াছে, চারিদিকে বড় বড় শাল গাছ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। কতক্ষণ পরে গাড়ি ঘুরিয়া এক ফাঁকা জায়গায় আসিল, তখন নীচের দিকে চাহিয়া দেখি, আমরা পাহাড়ের উপর। কখনও দক্ষিণে প্রকাণ্ড পাহাড়, বামে খাদ, কখনও বা দক্ষিণে খাদ ও বামে পাহাড়। ট্রামের রাস্তা মস্ত সাপের মত পাহাড়কে ঘিরিয়া অল্প অল্প উচ্চ হইয়া উপরে উঠিয়াছে। এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে চলিলাম। মাঝে মাঝে স্টেশন আছে। প্রথম স্টেশন তিনধরিয়া শিলিগুড়ি হইতে নয় ক্রোশ; এখানে ট্রেন পনর মিনিট থাকে। তিনধরিয়া হইতে যখন গাড়ি ছাড়িল, তখন চতুর্দিকে মেঘ কুয়াশার মত সাদা হইয়া চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। মেঘের ভিতর দিয়া গাড়ি চলিতে লাগিল। আশেপাশের ঘর-বাড়ি ছাড়া দূরের কিছুই দেখা যায় না; সমস্ত মেঘে ঢাকা। এক ক্রোশ উপরে যখন গাড়ি উঠিল, তখন ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বৃষ্টি হইতেছে, মেঘ ঈষৎ কাটিয়া আসিতেছে—নীচের পাহাড়ে চাহিয়া দেখি, সেখানে দিব্য রৌদ্র ফুট্ ফুট্ করিতেছে। এইরূপ আশ্চর্য দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মনে হইল পৃথিবী ছাড়িয়া উপরে স্বর্গের পথে যাইতেছি। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে গয়াবারি স্টেশনে পৌঁছিলাম। এখান হইতে গাড়ি ছাড়িলে নীচের পাহাড়ে কতকগুলি চা-ক্ষেত্র দেখা যায়। দূর হইতে চা-ক্ষেত্রগুলি অতি সুন্দর দেখায় মনে হয়, কে যেন পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট সবুজ ফোঁটা পরাইয়া দিয়াছে। তারপর আমরা কার্সিয়াং স্টেশনে পৌঁছিলাম। পূর্বে এ একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে পল্লী ছিল মাত্র, কিন্তু ক্রমে পাহাড়ের সমস্ত স্টেশনের মধ্যে একটি প্রধান শহর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কার্সিয়াং ৪৫০০ ফুট উচ্চ। যখন এখানে পৌঁছিলাম তখন আমি শীতে কাঁপিতেছি।

এরপর সোনাদহ স্টেশন, একটি ক্ষুদ্র পল্লী, কতকগুলি অপরিষ্কার বাজার দেখা যায় মাত্র। এখান হইতে ছাড়িয়া ঘুম স্টেশনে পৌঁছান গেল। অনেকে বলেন যে, পৃথিবীর কোন পাহাড়ের উপর এত উচ্চে রেলগাড়ি যায় নাই। ইহা ৭৪০০ ফুট উচ্চ। দার্জিলিং এই স্থান হইতে দুই ক্রোশ নীচে, সুতরাং গাড়ি নীচে নামিতে আরম্ভ করিল।



নামিবার সময় দক্ষিণ দিকে "জেলা পাহাড়ের" উপর সৈন্যদের বারিক অল্প অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। এবং অনেক দূরে "টণ্ডলু পর্বত" হিমালয়ের শৃঙ্গ "সিঙ্গলীলা" এবং নিকটে সারি সারি চা-ক্ষেত্র দেখা যায়। এক ক্রোশ নীচে যখন গাড়ি থামিল, তখন দূর হইতে দার্জিলিঙের ছোট ছোট সাদা সাদা বাড়িগুলি পাহাড়ের গায়ে ছবির মত বোধ হইতে লাগিল। এইরূপ মেঘ বৃষ্টি, রৌদ্রের মধ্য দিয়া পাহাড়, নদী, নির্ঝর এবং নানা প্রকার মনোরম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে দার্জিলিং আসিয়া পৌঁছিলাম। শিলিগুলি হইতে দার্জিলিং ২৪ ক্রোশ এবং সেখান হইতে দার্জিলিং পৌঁছিতে ছ'ঘণ্টা

লাগে। এই ছ'ঘন্টা যে কী সুন্দররূপে অতিবাহিত হয় তাহা লিখিয়া বর্ণনা করিতে আমি অক্ষম। বেলা দশটার সময় শিলিগুলি ছাড়িয়া বৈকাল চারিটার সময় পৌঁছিলাম।

অনুশীলনী

১। কলিকাতা হইতে দার্জিলিং অবধি পথের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

২। "রামশঙ্কর কামারকে পাড়ার লোকেরা পর্বত বলিয়া থাকে"—ইহার কারণ কি বুঝাইয়া বল।

৩। "এই স্থান হইতে কলের ট্রামগাড়িতে চড়িয়া পাহাড়ে উঠিতে হয়।"—কোন স্থান হইতে?

৪। টীকা লিখ: ট্রামগাড়ি, দামুকাদিয়া, কাসিয়াং।

৫। অর্থ লিখ: সশরীরে, মুষলধারে, নির্ঝর, মনোরম, অতিবাহিত।

৬। বাক্য রচনা কর: আশেপাশে, ঝম্‌ঝম্, ফুট্‌ফুট্।

৭। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা লিখ: "আনন্দে আমার বক্ষঃস্থল ততই হিমালয় অপেক্ষা ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।"

৮। পদ পরিবর্তন কর: উদয়, বাহুল্য, নূতন, দৃশ্য, উচ্চ।

৯। (ক) শূন্যস্থান পূরণ কর: এক — উপরে যখন — উঠিল, তখন —— করিয়া — পড়িতে লাগিল। (খ) এরপর সোনাদহ —, একটি ক্ষুদ্র ——, কতকগুলি অপরিষ্কার — দেখা যায় মাত্র।

বিষয় : ভ্রমণ কাহিনী। কলকাতা থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত পথের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। পথের সৌন্দর্য সহজ সরল ভাষায় বর্ণিত।

মূল্যায়ন — চিত্রধর্মী এমন বৃত্তান্ত ভাষা— সৌন্দর্যবোধের অবতারণা— ও প্রসঙ্গে উৎসাহ সঞ্চার।



স্বামী বিবেকানন্দ

—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

পরাধীন আত্মবিস্মৃত ভারতবর্ষে স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ঘটনা।

১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী। সেদিন পৌষ সংক্রান্তি। বাঙলার ঘরে ঘরে পৌষপার্বণের আনন্দোৎসব। প্রভাতে ৬টার পর জননী ভুবেনশ্বরী এক সুন্দর শিশু প্রসব করলেন। অন্নপ্রাশনের সময় বালকের নাম রাখা হইল শ্রীনরেন্দ্রনাথ। মা তাঁহার স্বপ্ন স্মরণ করিয়া নাম রাখিলেন, বীরেশ্বর। ছেলেবেলায় স্বামিজী খুব অশান্ত ও দুষ্ট ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত।

পাঁচ বৎসর বয়সে নরেন্দ্রের হাতেখড়ি হইয়াছিল। বাড়িতে গুরু মহাশয়ের নিকট 'বর্ণপরিচয়' শেষ হইলে বিশ্বনাথবাবু তাঁহাকে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউসানে পাঠাইয়া দিলেন।

১৮৭৯ সালে নরেন্দ্র প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রবেশ করেন। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের ভাল ভাল বই পাঠ করিতেন। পাঠ্যাবস্থায় নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসেন। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গোপনে পরমহংসদেবের উপদেশানুসারে সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন।



বাবার মৃত্যুর পর বিধবা মা ও ছোট দুইটি ভাইকে নিয়ে তিনি কষ্টে পড়িলেন। এই সময় তিনি বি. এ. পাশ করিয়া আইন পড়িতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার ভাবান্তর হইল। মনে মনে ভাবিলেন,—আমি কি মূঢ় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত গুরু পাইয়াও সামান্য সাংসারিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছি!

নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বারোজন শিক্ষিত, চরিত্রবান ও ধার্মিক যুবক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্মতিক্রমে সন্ন্যাসী হইলেন। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে ঠাকুর দেহত্যাগ করিলে ইঁহারা আর বাড়িতে ফিরিয়া গেলেন না।

বিবেকানন্দ তাঁহার গুরুভাইদের বলিতে লাগিলেন, যে দেশে অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র, ছোটজাত বলিয়া উপেক্ষিত, সে দেশের কল্যাণ নাই। জ্ঞান দিয়া, বিদ্যা দিয়া দীন দরিদ্র ও পতিতের সেবাই আমাদের প্রধান কাজ।

১৮৮৮ সালের শেষভাগে যে অশান্ত তরুণ সন্ন্যাসী বরাহনগর মঠ হইতে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল, ১৮৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে তাহার শেষ হইল। দক্ষিণ সমুদ্রতীরে কন্যাকুমারী বা হৈমবতী উমার মন্দির। এই মন্দিরের পাদদেশে ভারতবর্ষের সর্বশেষ প্রস্তরখানির

উপর বসিয়া ভাবিলেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যে উদার ধর্মমত শিখিয়াছিলাম, তাহা প্রচার করিয়াছি। তিনি ভাবিতে লাগিলেন অত্যাচারপীড়িত উপেক্ষিত জনসাধারণের অন্নেই আমরা জীবন ধারণ করিতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "এদেশে ধর্মের অভাব নাই, অভাব শিক্ষার, অভাব অন্নবস্ত্রের।"

আমেরিকার শিকাগো শহরে মহামেলার সহিত এক বিশ্ব-ধর্মসভার আয়োজন হইতেছিল। ১৮৯৩ সালে তিনি আমেরিকায় উপস্থিত হইলেন। পথে রেলগাড়িতে এক বৃদ্ধা মহিলার সহিত তাঁহার আলাপ হইল। এই মহিলার বাড়িতে একদিন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ রাইটের সহিত স্বামিজীর পরিচয় হইল। মিঃ রাইট ধর্মমহাসভার কর্মকর্তাদের একজনের নিকট এক-খানি পত্র দিলেন। তাহাতে তিনি লিখিলেন, "দেখিলাম এই অজ্ঞাতনামা হিন্দু সন্ন্যাসী আমাদের সকল পণ্ডিতগুলি একত্র করিলে যাহা হয়, তদপেক্ষাও অধিক পণ্ডিত।" স্বামিজী এই পত্র লইয়া শিকাগো যাত্রা করিলেন। স্বামিজীর বয়স তখন ৩০ বৎসর মাত্র। তিনি সরস্বতীকে ডাকিয়া বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। তিনি যখন প্রথমেই বলিয়া উঠিলেন, "হে আমেরিকাবাসী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ—" তখন সভার সেই আট-দশ হাজার লোক আনন্দে হাততালি দিয়া উঠিল। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, সমস্ত পৃথিবীর লোক স্বামিজীর নাম জানিতে পারিল।

দেশের ও দশের-সেবা করিবার জন্য বিবেকানন্দ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন", প্রতিষ্ঠা করিলেন। কলিকাতার কিছু দূরে গঙ্গার পশ্চিম তীরে সন্ন্যাসীদের জন্য "বেলুড় মঠ" প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি সর্বদাই বলিতেন, "শিক্ষাহীন ধর্মহীন বর্তমানে অবনতির কথা সকলকে বুঝিয়ে বল গে,—ভাইসব উঠ, জাগো, কতদিন আর ঘুমুবে?"

১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই, সুদীর্ঘ তিন ঘণ্টাকাল ধ্যান করিয়া স্বামিজী নামিয়া আসিলেন এবং "মন, চল নিজ নিকেতনে" গানটি

গাহিলেন। তিনি ধ্যান শেষ করিয়া মাটিতে মাদুর পাতিয়া শয়ন করিলেন এবং ঘুমন্ত শিশুর মত একটু কাঁদিয়া উঠিলেন। তারপর বালিশ হইতে তাঁহার মাথা গড়াইয়া পড়িল। সব শেষ হইয়া গিয়াছে। বাঙলার কর্মযোগী, সেবাধর্মের প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দের মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হওয়ার সংবাদে সারা দেশ বিষণ্ণ হইল।



ভগিনী নিবেদিতা স্বামিজীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আচার্যদেব তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের হৃদয়ে যে অমূল্য স্মৃতির সম্ভার রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে মনুষ্যজাতির প্রতি প্রেমই যে উজ্জ্বলতম রত্ন, তাহা আমরা অসঙ্কোচে নির্দেশ করিতে পারি!"

অনুশীলনী

১। নিচের কোন্ বাক্যটি ঠিক? উহাতে দাগ দাও:

(ক) স্বামিজী ছেলেবেলায় খুব অশান্ত ছিলেন।

(খ) স্বামিজী ছেলেবেলায় খুব দুষ্ট ছিলেন।

(গ) তাঁহার পড়াশুনায় মন ছিল না।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা লিখ—

"এদেশে ধর্মের অভাব নাই, অভাব শিক্ষার, অভাব অন্নবস্ত্রের।"

৩। অর্থ লিখ – স্বদেশপ্রেমিক, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, প্রচারক, অন্তরঙ্গ।

বিষয় — স্বামী বিবেকানন্দের জীবন সংক্ষেপে আলোচিত। তাঁর শিক্ষা— মানবপ্রেম ও দেশপ্রেমের কথা যুক্ত।

মূল্যায়ন — মহৎ জীবনের আদর্শ ও শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রেরণার সৃষ্টি।

বেহুলার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

—দীনেশচন্দ্র সেন

লেখক পরিচিতি—ঢাকা জেলার সুয়াপুর গ্রামে ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বি. এ. পাস করিয়া প্রধান শিক্ষক হিসাবে জীবন আরম্ভ করেন। ঐ সময় হইতেই তিনি বঙ্গভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামে একখানি সুবিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। স্যার আশুতোষ তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। তিনি আজীবন বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া গিয়াছেন ও বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।]

স্বর্গে দেবসভায় নেতা বেহুলাকে লইয়া গেলেন। ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু নিস্পন্দ হইয়া বেহুলার উপর পতিত হইল। চতুর্মুখ ব্রহ্মা কৌতূহল পরবশে তাঁহার আটটি চক্ষু দিয়া বেহুলাকে দেখিতে লাগিলেন। হরের ললাটের অগ্নি মৃদুরশ্মি হইয়া বেহুলার উপরে নিপতিত হইল।

বেহুলা সকলের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন? দেবগণ কহিলেন, "বেহুলা, আমরা তোমার স্বামী-ভক্তি ও তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, তুমি নর্তকীশ্রেষ্ঠা, একবার আমাদিগকে নর্তন করিয়া দেখাও।"

এ কি নিষ্ঠুর আজ্ঞা? এই কি নাচিবার সময়! কিন্তু দেবতাদের আদেশ। বেহুলা উত্তর না করিয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন।

বেহুলার সমস্ত শোক ও দুঃখ সেই নর্তনভঙ্গীকে কোমল করিয়া দিল। তাঁহার প্রতি পাদবিক্ষেপে দেবচক্ষে অশ্রু দেখা যাইতে লাগিল।

দেবতারা বলিলেন, "পুণ্যশীলে তুমি দৈবকর্তৃক যত বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছ, তাহার মধ্যে এই নাচের আদেশ পালন করাও সামান্য নহে। এই উৎকট পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইয়া আমাদিগকে লজ্জা দিয়াছ। তোমার কামনা শীঘ্রই পূর্ণ হইবে।"

দেবসভা হইতে জয়-বিষহরি মাতার আহ্বান হইল। কিন্তু কোথায় তিনি? দিকপালগণ বিষহরি মাতাকে খুঁজিতে লাগিলেন। চন্দ্রের দৃষ্টি জগতের প্রতি কোণে যায় না এবং তিনি রাত্রি না হইলে ভাল দেখেন না; তাঁহার দ্বারা সন্ধান হইল না। সূর্য সারাদিন খুঁজিয়া রাত্রে রাতকানা হইয়া পড়িলেন। বিষহরি-মাতার সন্ধান কেহ বলিতে পারিল না। তখন বেহুলার মুখ শুকাইয়া যাইল। তাঁহার পাঁজর ভাঙ্গিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

সেই শ্বাসে দেবাদিদেব শিব অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি নিজ দেহের ভস্মবিন্দু নেতা ধোপানীর চক্ষে কাজলের মত পরিতে দিলেন। সেই বিভূতির কাজল পরিয়া নেতা বিষহরিকে সন্ধান করিয়া দেবসভায় উপস্থিত করাইলেন।

তখন ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ সকলে লক্ষীন্দরের প্রাণদান করিবার জন্য বিষহরিকে অনুরোধ করিলেন। তখন মনসাদেবী দেবসভায় তাঁহার দুঃখের কথা বলিতে লাগিলেন। সনকা লুকাইয়া তাঁহার পূজা করিত। চাঁদ তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হিন্তালের লাঠি দিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। চম্পক নগরে ঢেড়া পিটাইয়া ঘরে ঘরে তাঁহার পূজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। ফলে দেবী তাহাকে

যত বিপদ দিয়াছেন, চাঁদ তাঁহাকে ততই বেশী অপমান করিয়াছে। এই অবস্থায় কেমন করিয়া তিনি নগণ্য মানুষের নিকট মাথা হেঁট করিবেন এবং তাহার প্রার্থনা ভিন্ন তাহার পুত্রের জীবন দান করিবেন? অভিমানে তাঁহার চোখের কোণে অশ্রু টলমল করিতে লাগিল।

মহাদেব তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া লক্ষীন্দরকে পুনর্জীবিত করিতে আদেশ দিলেন। চাঁদ সওদাগর যাহাতে তাঁহার পূজা করে, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিতে অঙ্গীকার করিলেন।

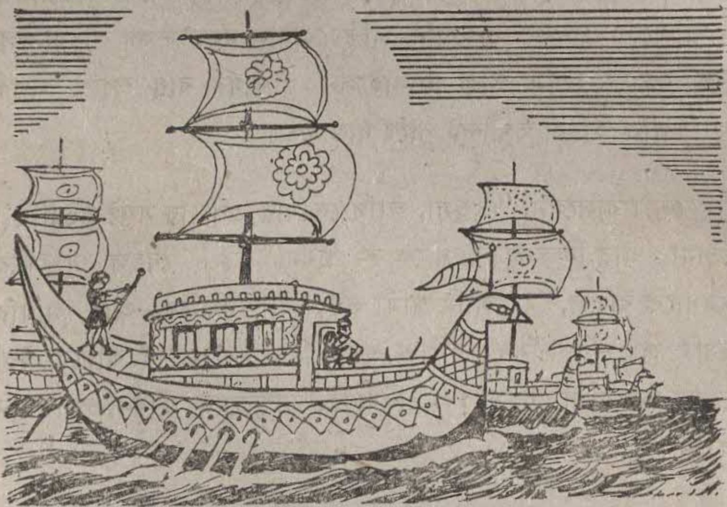
তখন প্রফুল্লচিত্তে বিষহরি লক্ষীন্দরের পুনর্জীবন দান করিলেন। লক্ষীন্দরের পায়ের একখানি অস্থি বোয়াল মৎস্য-ভক্ষণ করিয়াছিল বহু সন্ধানে তিনি তাহা আনাইলেন। স্বর্গের বায়ু স্পর্শে অপূর্ব কান্তিলাভ করিয়া লক্ষীন্দর পার্শ্বে দাঁড়াইল।

দেবী বলিলেন, "বেহুলা, আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার আর কিছু অভীষ্ট থাকে ত প্রার্থনা কর। বেহুলা যুক্তকরে মনসাকে বলিল, "মা, আমি স্বামী লইয়া বাড়ি ফিরিব, আর আমার ছয়টি জা শাঁখা-সিন্দুর-বর্জিত হইয়া নিরামিষ আহার করিবে ইহা কেমন করিয়া সহিব, মা? মা-বিষহরি, ভাসুরদের জীবনভিক্ষা দান করুন।"

মনসা দেবীর বরে তাঁহারাও জীবন লাভ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেবী প্রসাদে মগ্ন সপ্তডিঙ্গার স্থলে চৌদ্দডিঙ্গা লাভ হইল। 'গঙ্গা প্রসাদ' 'হংসরব' 'সাগরফেন, 'রাজবল্লভ' প্রভৃতি ডিঙ্গাগুলি কালীদহের ঝড়ে ডুবিয়া গিয়াছিল। ইহারাও যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিল। ইহাদের পুরোভাগে দৃষ্ট হইল ষোলশত দাঁড়বিশিষ্ট সমৃদ্ধ নগরীর ন্যায় সুবিশাল 'মধুকর' ডিঙ্গা।

দেবগণকে অসংখ্য প্রণাম করিয়া বেহুলা দেবসভা হইতে বাহির হইলেন। তখন বিষহরি বেহুলাকে বলিলেন, "তোমার, শ্বশুর যদি আমার পূজা না করে তাহা হইলে আমি যাহা কিছু দিয়াছি তাহা সমস্তই হারাইতে হইবে।" বেহুলার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু মহাদেবের আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া তিনি নিশ্চিত হইলেন।

চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া ছয় ভ্রাতাসহ লক্ষীন্দর যাত্রা করিলেন।



বেহুলা ভেলায় ভাসিতে ভাসিতে যে সমস্ত জায়গা দিয়া গিয়াছিলেন তাহা লক্ষীন্দরকে দেখাইতে লাগিলেন। এই করুণ কাহিনী শুনিয়া লক্ষীন্দরের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

অনুশীলনী

১। "এই কি নাচিবার সময়!"—কেন? বুঝাইয়া দাও।

২। "তোমার কামনা শীঘ্রই পূর্ণ হইবে।"—কে বলিয়াছিলেন? কেন?

৩। বিষহরি মাতাকে কিভাবে খুঁজিয়া বাহির করা হইল?

৪। বিষহরি মাতা দেবসভায় তাঁহার যে দুঃখের বর্ণনা দিয়াছিলেন তাহা নিজের ভাষায় লিখ।

৫। কোন্‌টি ঠিক বল:

(ক) সনকা লুকাইয়া তাঁহার পূজা করিত।

(খ) সনকা লুকাইয়া তাঁহার পূজা করিত না।

৬। বেহুলা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় লক্ষ্মীন্দরকে কি বলিলেন?

৭। অর্থ লিখ—নিষ্পন্দ, মৃদুরশ্মি, দীর্ঘশ্বাস, অঙ্গীকার, অন্তরাত্মা।

৮। বাক্য রচনা কর—পাদবিক্ষেপ, বর্জিত, তপস্যা, সমৃদ্ধ, ডিঙ্গা।

৯। পদ নির্ণয় কর—সুবিখ্যাত, মৃদুরশ্মি, বিড়ম্বনা, নিরামিষ, পুরোভাগে।

বিষয় — মনসা মঙ্গল কাব্যের অংশবিশেষ বর্ণিত। ইন্দ্রপুরীতে নৃত্যপ্রদর্শনে দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করে বেহুলার মৃতস্বামীর প্রাণলাভ ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। মনসার প্রচারে — [illegible] উদ্ভব। মনসার পূজার প্রচার।

মূল্যায়ন — প্রাচীন কাব্যসাহিত্যের বর্ণিত — সাধু ভাষায় লিখিত।



ছেলেধরা

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[লেখক পরিচিতি—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ এবং মৃত্যু ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৮। ইহাকে বলা হয় গল্পের যাদুকর। ইনি 'দেবদাস', 'শ্রীকান্ত', 'পথের দাবী' প্রভৃতি কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা।]

সেবারে দেশময় রটে গেল যে ছেলেধরারা শহরে ও গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কারও পোশাক ভিখারীর, কারও বা সাধুসন্ন্যাসীর, কেউ বা বেড়ায় লাঠি হাতে ডাকাতের মতো। কারও মনে শান্তি নেই, সব বাড়িতে কেমন একটা ছম্ ছম্ ভাব। এমনি যখন অবস্থা তখন আমাদের দেশেও হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে গেল। সেইটে বলি।

পথের অদূরে একটা বাগানের মধ্যে বাস করেন বৃদ্ধ মুখুজ্যে দম্পতি। ছেলেপুলে নেই, কিন্তু সংসারে ও সাংসারিক সকল ব্যাপারে

আসক্তি আঠার আনা। ভাইপোকে আলাদা করে দিয়েছেন, কিন্তু আর কিছুই দেন নি।

খুড়ো বললেন, তোর কিছুই নেই।

—না।

—নেই?

—আদায় করে আমি ছাড়বো।

রান্নাঘর থেকে খুড়ি বললেন, তোর ভারি ক্ষমতা! যা পারিস করগে।

হীরু এসে হাজির হল রাইপুরে। ঘরকয়েক গরীব মুসলমানদের পল্লী। মহরমের দিনে বড় বড় লাঠি ঘুরিয়ে তারা তাজিয়া বার করে। লাঠি তেলে পাকানো, গাঁটে গাঁটে পেতল বাঁধানো।

হীরু বললে, বড় মিঞা এই নাও দুটি টাকা আগাম। তোমার আর তোমার ভায়ের। কাজ উদ্ধার করে দাও, আরও বক্‌শিশ পাবে!

টাকা দুটি হাতে নিয়ে লতিফ মিঞা হেসে বললে, কি কাজ বাবু?

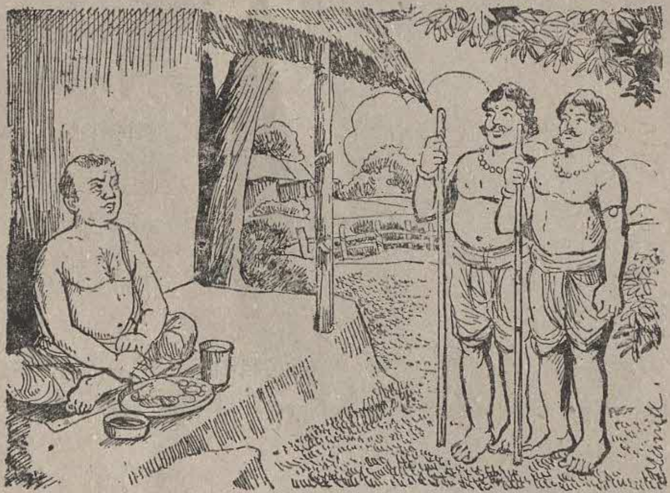
হীরু বললে, এ দেশে কে না জানে তোমাদের দু' ভায়ের কথা। লাঠির জোরে বিশ্বাসদের কত জমিদারি হাসিল করে দিয়েছ—তোমরা মনে করলে পারো না কি!

বড় মিঞা চোখ টিপে বললে, চুপ্‌ চুপ্‌ বাবু! থানার দারোগা শুনতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। বীরনগর গ্রামখানাই যে দু'ভায়ে দখল করে দিয়েছি, এ যে তারা জানে। কেউ চিনতে পারে নি বলেই ত' সে যাত্রা বেঁচে গেছি।

হীরু আশ্চর্য হয়ে বললে, কেউ চিনতে পারে নি?

লতিফ বললে, পারবে কি করে! মাথায় ইয়া পাগ্‌ড়ি বাঁধা, গালে গালপাট্টা, কপালে কপালজোড়া সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে ছ-হাতি লাঠি,—লোকে ভাববে হিঁদুর যমপুরী থেকে যমদূত এসে হাজির হলো। চিনবে কি – কোথায় পালালে তার ঠিকানা রইল না।

হীরু হাতখানা ধরে বললে, বড় মিঞা, এই কাজটি আর একবার তোমাকে করতে হবে, দাদা। আমার খুড়ো তবু যা হোক দুটো ভাগের ভাত দিতে চায়, কিন্তু খুড়ি যে একটা চুমকি ঘটিতে পর্যন্ত হাত দিতে দেয় না। পাগড়ি, গালপাট্টা আর সিঁদুর মেখে লাঠি হাতে একবার গিয়ে উঠানে দাঁড়াবে, তোমাদের ডাকাতে হুমকি একবার ঝাড়বে, তারপর দেখে নেবো কিসে কি হয়। আমার যা কিছু পাওনা ফেড়ে বার করে আনবো। ঠিক সন্ধ্যার আগে—ব্যাস।



একাদশী। সারাদিনের পর দাওয়ায় ঠাঁই করে দিয়েছেন জগদম্বা। মুখুজ্যে মশাই বসেছেন জলযোগে। সামান্য ফল-মূল ও দুধ। বেতো ধাত—একাদশীতে অন্নাহার সহ্য হয় না। পাথরের বাটিতে ডাবের জলটুকু মুখে তুলেছেন, এমন সময় দরজা ঠেলে ঢুকলো দুভাই—লতিফ আর মামুদ! ইয়া পাগড়ি, ইয়া গালপাট্টা, হাতে ছ-হাতি লাঠি, কপালজোড়া সিঁদুর মাখানো! মুখুজ্যের হাত থেকে পাথরের বাটি দুম্ করে পড়ে গেল,—জগদম্বা চীৎকার করে উঠলেন,—ওগো পাড়ার লোক, কে কোথায় আলো, এসো, গো, ছেলেধরা ঢুকছে।

সুমুখের ছোট মাঠটায় ঘর কেটে ছোট ছেলের দল রোজ ফিঙে খেলে, আজও খেলছিলো,—তারাও চেঁচাতে চেঁচাতে যে যেখানে পারলে ছুট দিলে—ওগো ছেলেধরা এসেছে, অনেক ছেলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

হীরু সঙ্গে এসেছিলো বাড়ি চিনিয়ে দিতে। দোরের আড়ালে লুকিয়েছিল—সে চাপা গলায় বললে—আর দেখ কি মিঞা, পালাও, পাড়ার লোক ধরে ফেললে আর রক্ষে নেই। বলেই নিজে মারলে ছুট।

লতিফ মিঞা শহরের আর কিছু না শুনে থাক, ছেলেধরার জনশ্রুতি তাদের কানেও এসে পেঁাচেছে। চক্ষের পলকে বুঝলে এ অজানা জায়গায় এইরূপ বেশে এই সিঁদুরমাখা মুখে ধরা পড়ে গেলে দেহের একখানা হাড়ও আস্ত থাকবে না, সুতরাং তারাও মারলে ছুট। কিন্তু ছুটলে হবে কি? পথ অচেনা, আলো এসেছে কমে —চতুর্দিক থেকে কেবল বহু কণ্ঠের সমবেত চীৎকার—ধরে ফ্যাল, ধরে ফ্যাল! মেরে ফ্যাল ব্যাটাদের। ছোট ভাই মামুদ কোথায় পালালো ঠিকানা নেই, কিন্তু বড় ভাই লতিফকে সবাই ঘিরে ফেললে —সে প্রাণের দায়ে কাঁটাবন ভেঙ্গে লাফিয়ে পড়লো একটা ডোবায়। তারপর পাড়ে দাঁড়িয়ে সবাই ছুড়তে লাগল ঢিল। যেই মাথা তোলে অমনি মাথায় পড়ে ঢিল। আবার সে মারে ডুব। আবার ওঠে, আবার মাথায় পড়ে ঢিল।

লতিফ মিঞা জল খেয়ে, আর ইঁট খেয়ে আধমরা হয়ে পড়লো। সে যতই হাতজোড় করে বলতে চায় সে ছেলেধরা নয়, ছেলে ধরতে আসে নি,—ততই লোকের রাগ আর সন্দেহ বেড়ে যায়। তারা বলে— নইলে ওর গালপাট্টা কেন? ওর পাগড়ি কিসের জন্য? ওর মুখময় এত সিঁদুর এল কোথা থেকে? পাগড়ি তার খুলে গেছে, গালপাট্টা একেবারে ঝুলছে—কপালের সিঁদুর জলে ধুয়ে মুখময় লেগেছে। এসব কথা সে পাড়ের লোকদের বলেই বা কখন, শোনেই বা কে!

ততক্ষণ কতকগুলি উৎসাহী লোক জলে নেমে লতিফকে হিঁচড়ে টেনে তুলেছে—সে কাঁদতে কাঁদতে কেবলই জানাচ্ছে, সে লতিফ মিঞা, তার ভাই মামুদ মিঞা—তারা ছেলেধরা নয়।

অনুশীলনী

১। "আদায় করে আমি ছাড়বো!"—কে বলেছিল? কেন?

২। কোন্‌টি ঠিক বল—

(ক) ছেলেধরা ঢুকেছে।

(খ) ছেলেধরা ঢোকে নি।

৩। মামুদ মিঞা যে বিপদে পড়েছিল তার একটি বর্ণনা দাও।

৪। বাক্য রচনা কর—ছম্‌ছম্, আসক্তি, হাসিল, অন্নাহার, অচেনা।

৫। পদ পরিবর্তন কর—বৃদ্ধ, আশ্চর্য, সহ, সন্দেহ।

বিষয় — ছেলেধরাদের নিয়ে রম্য রচনা। পিতৃব্য কর্তৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবার পর দুই ছেলেকে সাহায্য কার্যসিদ্ধ করতে গিয়ে ছেলেদের যে দুর্গতি ঘটে গিয়েছিল তারই হাস্য-রসাত্মক কাহিনী।

মূল্যায়ন — রম্যরচনার রস আস্বাদন।



শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দিরের পক্ষে
শ্রীনিত্যানন্দ বসু ও শ্রীসোমনাথ মুখোপাধ্যায়

অবিস্মরণীয় সেই দিন,—১৫ আগস্ট, ১৮৭২। দিব্যমানবের আবির্ভাব হল কলিকাতার থিয়েটার রোডের বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দরূপে।

শ্রীঅরবিন্দ কোন্নগরের বিখ্যাত ঘোষ বংশের সন্তান ও ঋষি রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠ জামাতা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ ও কন্যা স্বর্ণলতা দেবীর তৃতীয় পুত্র। মধ্যম পুত্র বিখ্যাত ইংরাজী সাহিত্যিক ও কবি মনমোহন ঘোষ এবং কনিষ্ঠ পুত্র বাংলার অগ্নিযুগের অন্যতম বিপ্লবী নায়ক বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

শ্রীঅরবিন্দের পিতা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন একদিকে সদালাপী, অমায়িক, পরোপকারী, অন্যদিকে ছিলেন সম্পূর্ণ ইংরেজ। শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা শুরু হলো ইংরেজী স্কুলে।

১৮৭৯ সালে মাত্র সাত বছরের ছেলে শ্রীঅরবিন্দ বাবা কৃষ্ণধন ঘোষের সাথে উপস্থিত হলেন ইংলণ্ডে। ১৮৮৫ সালে লণ্ডনের সেণ্ট পল্‌স্ স্কুলে ভর্তি হলেন। এই স্কুল জীবনেই ছাত্র শ্রীঅরবিন্দ হয়ে উঠলেন কবি শ্রীঅরবিন্দ। সেণ্ট পল্‌স্ স্কুলের শেষ পরীক্ষায় শ্রীঅরবিন্দ সমস্ত ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করে সিনিয়র ক্লাসিকাল বৃত্তি নিয়ে ১৮৮৯ সালের শেষ ভাগে যোগ দিলেন কেম্ব্রিজের কিংস কলেজে। কলেজ জীবনে শ্রীঅরবিন্দকে দেখি এক মেধাবী ছাত্ররূপে। যিনি ইতিহাসে, সাহিত্যে এবং গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মানি প্রভৃতি ভাষায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন।

১৮৯০ সালে আই. সি. এস. পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়েও শিক্ষানবিশি কালের পর ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় নিজেকে অনুপস্থিত রেখে ইচ্ছাকৃত অসাফল্যের অমর্যাদা বরণ করে নিলেন। সিভিল সার্ভিসের অযোগ্য বলে ঘোষিত হলেন।

১৮৯৩ সালে বরোদার রাজ সরকারে চাকুরি গ্রহণ করে ভারতের মাটিতে পদার্পণের সাথেই শুরু হল শ্রীঅরবিন্দের বিচিত্র বহুমুখী কর্মজীবন। এই ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারীতেই শ্রীঅরবিন্দের পিতৃবিয়োগ হল। "সাবিত্রী" শীর্ষক তাঁর মহাকাব্যের শুরু হয়েছিল এই বরোদায়।

বরোদায় সাক্ষাৎ হয় শ্রীঅরবিন্দের সাথে ভারতভগিনী নিবেদিতার। দুই স্বাধীনতাকামী চিত্ত পরস্পর প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। ভগিনী নিবেদিতা আহ্বান জানালেন শ্রীঅরবিন্দকে বাংলার বিপ্লবী মাটিতে কাজ করার জন্য। এরপর এল সেই প্রতীক্ষিত লগ্ন। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গ-ভঙ্গ আইন পাস করেন।

১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল কংগ্রেসের অধিবেশন। এই অধিবেশনে শ্রীঅরবিন্দের প্রচেষ্টায় প্রস্তাব গৃহীত হল—কংগ্রেসের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা—দাবি স্বরাজ—পথ স্বদেশী গ্রহণ, বিদেশী বর্জন, বিলেতী সব কিছু বয়কট করা। ভারতের মধ্যে

শ্রীঅরবিন্দই প্রথম নির্ভয়ে অবিমিশ্র পূর্ণ স্বাধীনতার কথা প্রকাশ্য-ভাবে ঘোষণা করতে থাকলেন। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় ২৭শে জুন, ১৯০৭-এর সংখ্যায় 'ইণ্ডিয়া ফর দি ইণ্ডিয়ানস্' প্রবন্ধ প্রকাশের জন্যই বিশ্বকবি ১৯০৭ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের বন্দেমাতরমে লিখলেন, "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার"। বললেন, "হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু— স্বদেশ আত্মার বাণী-মূর্তি তুমি।"

তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল ১৯০৮ সালের ৫ই মে। আলিপুর বোমার মামলার আসামী হিসাবে গ্রেপ্তার হয়ে আলিপুর জেলে নীত হলেন। এই কারাজীবনেই শ্রীঅরবিন্দের "কারাকাহিনী"র জন্ম হল। দীর্ঘ এক বৎসর বাদে ঐতিহাসিক আলিপুর বোমার মামলার পরিসমাপ্তি হল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পেলেন।



এর পর চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দ নির্জন সাধনায় মগ্ন হলেন। অল্প কিছুদিন পরে অন্তরের আহ্বান এলো—যেতে হবে পণ্ডিচেরী। উত্তর পাড়ার কয়েকজন তরুণ বিপ্লবী তাঁকে নৌকোয় নিয়ে এলেন কলকাতায়। তুলে দিলেন "তুপ্লে" জাহাজে। "তুপ্লে" জাহাজ কলকাতা বন্দর ছাড়িয়ে বঙ্গোপসাগরের দিগন্তে বিলীন হয়ে গেল। ১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল পণ্ডিচেরীর মাটিতে পা দিলেন তিনি। বিপ্লবী প্রাণ-পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ হলেন যুগস্রষ্টা ঋষি অরবিন্দ।

তাঁর মহাপ্রয়াণের ক্ষণ ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫০ সালের রাত ১-২৫ মিনিট। যেদিন শিক্ষক সাংবাদিক, বিপ্লবী, কবি আর দিব্যমানব সৃষ্টির যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর শ্রীঅরবিন্দ এই পার্থিব দেহ ত্যাগ করে লীন হয়ে গেলেন পরমলোকে।

অনুশীলনী

১। শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষালাভ হয় কোথায়? তাঁহার রচিত প্রধান গ্রন্থ কি?

২। বিশ্বকবি শ্রীঅরবিন্দকে নমস্কার জানালেন কেন?

৩। শ্রীঅরবিন্দ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কাছ থেকে কি উপহার পেয়েছিলেন?

৪। শ্রীঅরবিন্দের শেষ জীবন কোথায় কেটেছিল?

৫। প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লেখ—"বিপ্লবী প্রাণপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ হলেন যুগস্রষ্টা ঋষি অরবিন্দ।"

৬। টীকা লেখ—বারীন্দ্রকুমার, মহাকাব্য, ভগিনী নিবেদিতা, বিশ্বকবি, বঙ্গ-ভঙ্গ।

৭। অর্থ বল—অবিস্মরণীয়, আবির্ভাব, মেধাবী, স্বাধীনতাকামী চিত্ত, বিপ্লবী।

৮। সন্ধি বিচ্ছেদ কর—পরোপকার, সদালাপী, উপাধ্যক্ষ।

বিষয় — ঋষি অরবিন্দের জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

মূল্যমান — দিব্য জীবনের আদর্শের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি।



অভিনন্দন সভা

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[**লেখক পরিচিতি**—১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। পিতৃ নিবাস ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা। তিনি বি. এ. পাস করিয়া শিক্ষকতা কর্মে নিযুক্ত হন। ভাগলপুরে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'পথের পাঁচালী' রচিত হয়। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। 'অভিনন্দন-সভা' তাঁহার রচিত 'ছায়াপথ' হইতে সংকলিত। ১৯৫০ সালের ১লা নভেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।]

এবার দেশে গিয়ে দেখি গৌর পিওন পেন্‌সন্‌ নিয়েছে কত কাল পরে? বহুদিন···বহুদিন।

গৌর···পিওন। (গৌরচন্দ্র হালদার) অনড় ও অচল অবস্থায় এক ডাকঘরে, এক ডাকের ব্যাগ ঘাড়ে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর ডাক-হরকরার কাছ করে আসছে। মধ্যে তিন বছরের জন্য সে কেবল

কোট চাঁদপুরে গিয়েছিল, তাও তার মন সেখানে টেঁকে নি। ওভারশিয়ারের কাছে কান্নাকাটি করে আবার চলে এসেছিল আমাদের এই ডাকঘরে।

১৯১২ সালের ৭ই জুলাই সে ভর্তি হয়েছিল এখানকার ডাকঘরে। তাই মুখেই শুনেছি আমি তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। বাবা বিদেশ থেকে টাকা পাঠাতেন, ও আমাদের বাড়ি এসে বলতো, টাকা নিয়ে যান বাবাঠাকুর।

গৌর পিওন তিন চার বছর কাজ করার পরই গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। পুনরায় ফিরল দীর্ঘ আঠার বছর পরে।

সেই দিনই বিকালে দেখি, গৌর পিওন চিঠি বিলি করতে এলো আমাদের বাড়ি। সত্যি অবাক হয়ে গেলাম।

গৌর পিওন উঠান থেকে রোয়াকে উঠে এসে বললে—প্রাতঃ-পেন্নাম বাবা-ঠাকুর।

—গৌর যে! ভালো আছ? এখনো তুমি এখানে ডাকবিলি করছো?

—আপনাদের আশীর্বাদে এক রকম চলে যাচ্ছে, বাবাঠাকুর।

—কতদিন চাকরি হল গৌর কাকা?

—রোজ ক'খানা গাঁ বেড়াতে হয়?

'পাঁচ-ছ'খানা গাঁয়ে বিট্ থাকে রোজ। পাঁচ-ছ' ক্রোশ হাঁটতে হয় দৈনিক। জলে কাদায় হানিভাঙ্গা, দুগ্‌গোপুর, সরভোগ এসব জায়গায় যেতে বড্ড কষ্ট হয়।

পরদিন সকালে গৌর পিওন চিঠি বিলি করতে এল। এসে বললে, আজই আমার চাকরির শেষ দিন, বাবাঠাকুর।

—আজই শেষ দিন!

—আজই, বাবাঠাকুর। পঁয়ত্রিশ বছর তিন মাস পূর্ণ হল আজ।

—বোস। একটা পাকা আনারস নিয়ে যাও, বেশ মিষ্টি।

গৌর কিছুক্ষণ বসে গল্পসল্প করে চলে গেল।

তারপর একদিন বিদায়ী মহকুমা হাকিমের অভিনন্দন সভা থেকে ফেরবার পথে বার বার মনে হল আমি গৌরপিওনকে অভিনন্দন দেব না কেন? সত্যিকারের সমাজসেবক সে, পঁয়ত্রিশ বছর ধরে গ্রামে চিঠি বিলি করে এসেছে। জল-ঝড়কে তুচ্ছ করে, শীত মানে নি; গ্রীষ্ম মানে নি।

গ্রামে তরুণ সংঘের ছেলেদের কাছে কথাটা পাড়তেই তারা তখনই রাজী হয়ে গেল। সংঘের কর্মী নিতাই বললে, খুব ভাল কাকা। নতুন জিনিস হবে আমাদের দেশে।

বড় চাঁদনিতে গিয়ে দেখলাম ছোকরার দল দিব্যি সভা সাজিয়েছে। রঙিন কাগজের মালা, দেবদারু পাতা, মায় কলাগাছ —কিছু বাদ যায় নি। স্কুল থেকে চেয়ার-বেঞ্চি আনিয়েছে। ভেঁপু মুখে বলে বেড়াচ্ছে—"আজ বেলা পাঁচটায় অবসরপ্রাপ্ত পিওন গৌরচন্দ্র হালদারের বিদায় অভিনন্দন সভা হবে বড় চাঁদনিতে—দলে দলে যোগদান করুন।"

স্কুলের ছেলেরা ভিড় করে এলো সভায়। মাস্টারের মধ্যে কেউ আর বাদ রইলেন না। বাজারের লোকও সকলে এলো—কি হয় দেখতে। ফলে, সভা আরম্ভ হওয়ার আগেই বসবার আসন সব ভর্তি হয়ে গেল। লোকে চারিদিকে দাঁড়িয়ে থাকতে আরম্ভ করলে।

গৌর পিওনের দিকে চেয়ে দেখলাম, ওর মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়েছে। গৌর চার ধারে চেয়ে চেয়ে দেখছে, এ কি ব্যাপার!

ছেলেরা সভায় দল বেঁধে এলো। প্রত্যেকের হাতে একগাছা করে ফুলের মালা, আর একজনের হাতে চন্দনের বাটি। উদ্বোধনী সঙ্গীত শুরু হল—

"শরতের আজ কোন্ অতিথি এলো প্রাণের দ্বারে।"

একটি ছোট মেয়ে সভাপতির গলায় ফুলের মালা দিল। সভাপতি কর্তৃক গৌর পিওনের কপালে চন্দন মাখিয়ে দেওয়া হল এবং গলায় মালা পরিয়ে দেওয়া হল।

বেচারী গৌর পিওন বিমূঢ় বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। একে একে বক্তাদের নাম ডাকা হতে লাগলো। এদের মধ্যে সভায় বক্তৃতা কখন কেউ দেয় নি। সভায় উঠে মুখ শুকিয়ে গলা কাঠ হয়, চোখে



সরষের ফুল দেখে। বক্তারা আর কিছু বলবার না পেয়ে গৌর পিওনকে একেবারে আকাশে তুলে দিল!

গৌর পিওন কিছু বলতে উঠে ঝর্‌ঝর্ করে কেঁদে ফেললে। শুধু সে হাত জোড় করে সভাস্থ সকলের দিকে চেয়ে দু-তিনবার বললে—বাবুরা, বাবুরা—। তারপর সবাইকে করজোড়ে বার বার প্রণাম করে সে ধুপ করে বসে পড়ল। এবার সভা ভঙ্গ হল।

চাঁদনির পাশে হরি ময়রার দোকানে হাত ধরে গৌর পিওনকে নিয়ে যাওয়া গেল। সে চলে যাচ্ছিল বাড়ির দিকে। আমিও গেলাম—ওদের পিছনে পিছনে।

তা' ছেলেরা আয়োজন করেছে ভালো। দুটো ফজ্‌লি আম ও দই, সন্দেশ আর নিমকি! বড় রাজভোগ যে কটা পারে। খেয়ে খুশী গৌর। চোখে তার প্রায় জল এসে গেল আবার।

আমার দিকে চেয়ে বললে—এমন দিনডা যে হবে, তা ভাবি নি। সব আপনার কাণ্ড, আমি তা বুঝেছি। কি খাওয়াডাই খাওয়ালেন, কি ভালো কথাই বললেন আমার সম্বন্ধে। বড্ডো গুরুবল আমার।

ওর গলায় এখনো সেই ফুলের মালা।

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১। গৌর পিওনকে সমাজসেবক বলা হয়েছে কেন?

২। গৌর পিওনের অভিনন্দন সভার বর্ণনা নিজের ভাষায় বল।

৩। "বড্ড গুরুবল আমার।"—কে বলেছিল? কেন বলেছিল?

৪। টীকা লেখ—ডাক-হরকরা, পাড়েজী, মহকুমা হাকিম।

৫। অর্থ বল—অভিনন্দন, বাওড়, অবসরপ্রাপ্ত, শুষ্ক, করজোড়ে।

৬। ব্যাখ্যা লেখ—"কতদিন পরে দেশে এলাম, বাহিরের জগতের কত পরিবর্তন ঘটে গেল।"

বিষয় — প্রবন্ধে এক ডাক-পিওনের কাহিনী। তাকে সমাজসেবকের মর্যাদা দিয়ে প্রবন্ধে বলেছেন তার চাকুরী জীবনে অবসানে যে অভিনন্দন দান করেছিল তার এক মর্মস্পর্শী বর্ণনা।

মূলভাব — সমাজের সেবামূলক নগণ্য নিম্ন শ্রেণীর এক ডাক-পিওনকে সমাজ লোকের মর্যাদা দিয়ে মানবিকতা ও সমাজ-সচেতন পরিচয় দেওয়া হয়েছে। নিম্নশ্রেণীর মানুষকে ~~[illegible]~~ সামাজিক মর্যাদা দিয়ে এক মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।



—বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)

হিমালয় ভারতের গৌরব। কবি কালিদাস হিমালয়কে দেবতাত্মা নগাধিরাজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতের উত্তর সীমায় এই বিশাল পর্বতমালা। এই পর্বতমালাই ভারতের বড় বড় নদীর জন্মদাতা। এই হিমালয়ের বহু শৃঙ্গ। উচ্চতম শৃঙ্গটির নাম মাউণ্ট এভারেস্ট।

১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে এভারেস্ট শৃঙ্গের উচ্চতার আনুমানিক পরিমাণ নির্ণীত হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের সম্মান যে প্রতিভাবান বঙ্গ-সন্তানের প্রাপ্য, তাঁহার নাম রাধানাথ শিকদার। কিন্তু তাঁহার নামানুসারে শৃঙ্গটির নাম না হইয়া তদানীন্তন জরিপ বিভাগের অধিকর্তার নামে মাউন্ট এভারেস্ট নাম হয়। ইহার উচ্চতা উনত্রিশ হাজার এক শত একচল্লিশ ফুট।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দেই এভারেস্ট অভিযান প্রথম আরম্ভ হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের সাজ-সরঞ্জাম লইয়াও মানুষ হিমালয়ের নিকট পরাস্ত হইল। পঁচিশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠিয়া প্রথম দল ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। এই অভিযাত্রীরা সকলেই ছিলেন ইয়োরোপীয়। ইয়োরোপ

হইতে দ্বিতীয় দল আসিলেন ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে। এই অভিযানের নায়ক ছিলেন ম্যালোরি। পাহাড়ের চূড়ায় উঠিতে মাত্র ছয় শত ফুট বাকী, তখন তুষারের ঝটিকা তাঁহাদের কোথায় লইয়া গেল তাহা আজও কেহ জানেন না।

মানুষ কিন্তু নিরস্ত হয় নাই। ইহার পরও ১৯৩৩।৩৬।৩৯।৫১ সালে আবার অভিযান হয়। কিন্তু কোন অভিযানেই তাঁহারা আটাশ হাজার ফুটের উপরে উঠিতে পারেন নাই। ১৯৫২ সালে শেরপা তেনজিং ও ল্যাম্বেয়ার নামে একজন সুইস অভিযাত্রী ২৮,৫৫০ ফুট পর্যন্ত উঠিয়াছিলেন। কিন্তু ল্যাম্বেয়ার নিজে ভাঙ্গিয়া পড়ায় এবারও এভারেস্ট জয় হইল না। 'শেরপা' কথাটির মানে—পাহাড়ী সিংহ। বিশ্ববিখ্যাত শেরপা তেনজিং নোরকের জন্ম থামী নামক এক গ্রামে। কৈশোর হইতেই তিনি পর্বত অভিযাত্রীদের সঙ্গে ভারবাহীরূপে পর্বত আরোহণ করিতেন।



তাহার পর আসিল ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে কর্ণেল হাণ্টের নেতৃত্বে এক বিখ্যাত অভিযাত্রী দল। এই দলটি তেনজিংয়ের সাহায্য চাহিলে তিনি বলিলেন, 'আমি যতদূর উঠিতে পারিব আমাকে ততদূর উঠিতে দিতে হইবে।'

এই শর্তেই রাজি হইয়া তাঁহারা কাঠমাণ্ডু হইতে যাত্রা করিলেন। তেনজিং নোরকে এবং হিলারী এভারেস্ট শৃঙ্গের ২৮,০০০ ফিট পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নাকে তাঁহাদের অক্সিজেনের নল, হাতে বরফ কাটিবার কুঠার, সর্বাঙ্গে নানাবিধ সাজ-সরঞ্জাম। একজন আর একজনের কোমরের সহিত শক্ত দড়ি দিয়া বাঁধা। কঠিন তুষারশৃঙ্গ খাড়া হইয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে। কুঠার দিয়া সিঁড়ি কাটিয়া কাটিয়া

উহারা উপরে উঠিতেছেন। চারিদিকে ভীষণ বেগে ঝড়, ঠাণ্ডায় হাত-পা জমিয়া যাইবার উপক্রম। তবুও তাঁহারা উঠিতেছেন। আর চল্লিশ ফুট মাত্র বাকী। কিন্তু হায়! সম্মুখে একটা খাড়াইয়ের পাশেই একটা ফাটল। তাহাতে পা রাখিয়া এবং আর এক পাশে পিঠ রাখিয়া পিছলাইয়া পিছলাইয়া তাঁহারা উপরের দিকে উঠিতে লাগিলেন। হঠাৎ হিলারীর পা ফসকাইয়া গেল। দড়ি টানিয়া ধরিয়া তেনজিং তাঁহাকে বাঁচাইলেন। আবার সাবধানে ধাপ কাটিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন তাঁহারা। অবশেষে এতদিনের প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হইল। তেনজিং হিমালয়ের চূড়ায় রাষ্ট্রসংঘ, বৃটেন, ভারত ও নেপালের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিলেন। মানুষ পৃথিবীর উচ্চতম শীর্ষে আরোহণ করিয়া সগর্বে চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মানুষের দৃঢ় পণ, অধ্যবসায় ও বীরত্ব সফলতার মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া ইতিহাস রচনা করিল।

ধন্য তেনজিং, ধন্য হিলারী।

অনুশীলনী

১। এভারেস্ট নাম হল কেন?
২। সর্বপ্রথম এভারেস্টের উচ্চতা নির্ণয় করেন কে?
৩। অভিযানের সার্থকতা কি?
৪। ব্যাখ্যা লেখ—"মানুষের দৃঢ় পণ…ইতিহাস রচনা করিল।"
৫। টীকা লেখ—নগাধিরাজ, মাউণ্ট এভারেস্ট, সরঞ্জাম, ম্যালোরি

বিষয় — হিমালয় অভিযানে এভারেস্ট শৃঙ্গবিজয় কাহিনী সম্বন্ধে আলোচিত।

মূলভাব — মানুষের দৃঢ়পণ, অধ্যবসায় ও বীরত্ব সফলতার মহিমায় উজ্জ্বল হইয়াছে উদাহরণ



—কাশীরাম দাস

[**লেখক পরিচিতি**—কাশীরাম দাসের আবির্ভাব-কাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিক। পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলার সিঙ্গি গ্রামে। পিতার নাম কমলাকান্ত। তাঁহার রচিত 'মহাভারত' বাংলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ।]

অবন্তী নগরে ছিল দ্বিজ একজন।
তাঁর স্থানে শিষ্যগণ করে অধ্যয়ন॥
আরুণি নামেতে শিষ্য ছিল একজন।
ডাকি তারে গুরু আজ্ঞা কৈল ততক্ষণ॥
ধান্য ক্ষেত্রে সব জল যাইছে বহিয়া।
যত্ন করি আলি বাঁধি জল রাখ গিয়া॥
আজ্ঞা মাত্র আরুণি যে করিল গমন।
আলি বাঁধিবারে বহু করিল যতন॥
দন্তেতে খুদিয়া মাটি বাঁধে লয়ে ফেলে।
রাখিতে না পারে মাটি অতি বেগ জলে॥
পুনঃ পুনঃ শিষ্যবর করিল যতন।
নারিল ক্ষেত্রের জল করিতে বন্ধন॥
জল বহি যায়, গুরু পাছে ক্রোধ করে।
আপনি শুইল দ্বিজ বাঁধের উপরে॥

সমস্ত দিবস গেল, হইল রজনী।
না আইল শিষ্য, দ্বিজ চলিল আপনি ॥
ক্ষেত্রমধ্যে গিয়া ডাক দিল দ্বিজবর।
শিষ্য বলে, শুয়ে আছি বাঁধের উপর ॥
বহু যত্ন করিলাম, না রহে বন্ধন।
আপনি শুইনু বাঁধে তাহার কারণ।
শুনিয়া বলিল গুরু, আইস উঠিয়া।
শীঘ্র আসি গুরু পায় প্রণমিল গিয়া ॥
আশিস করিয়া গুরু করিল কল্যাণ।
চারি বেদ, ষট্ শাস্ত্রে হোক তব জ্ঞান ॥
এত বলি বিদায় করিল শিষ্যবর।
প্রণাম করিয়া শিষ্য গেল নিজ ঘর ॥

অনুশীলনী

১। আরুণির উপাখ্যানটি নিজের ভাষায় লেখ।
২। আরুণির স্বভাব কিরূপ বুঝিয়ে বল।
৩। ব্যাখ্যা লেখ—"আশিস করিয়া গুরু করিল কল্যাণ।
চারি বেদ, ষট্ শাস্ত্রে হোক তব জ্ঞান ॥"
৪। অর্থ লেখ—আলি, খুদিয়া, বাঁধ, দ্বিজবর, রজনী।
৫। বাক্য রচনা কর—দ্বিজ, দন্ত, ক্ষেত্র, শিষ্য, বিদায়।
৬। পদ নির্ণয় কর—পুনঃ পুনঃ, রজনী, ক্রোধ, ষট্, এত।
৭। টীকা লিখ—আরুণি, অবন্তী, দ্বিজ, বাঁধ, চারি বেদ।
৮। শূন্যস্থান পূরণ কর—
(ক) —— ক্ষেত্রের জল করিতে ——।
(খ) —— করিয়া —— করিল ——।

বিষয় — বাংলার মহাভারতের কাশীরাম দাস রচিত উপাখ্যানে
শিষ্য আরুণি গুরু আজ্ঞা পালনে কঠিন পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ।
মূল্যায়ন — যথার্থ শিষ্যের গুরুভক্তির আদর্শ নিদর্শন।

রসাল ও স্বর্ণলতিকা



—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[**লেখক পরিচিতি**—মাইকেল মধুস্থদন দত্তের জন্ম ২৫শে জান্নুয়ারী, ১৮২৪, মৃত্যু ২৯শে জুন, ১৮৭৩। নিবাস যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রাম। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত সেকালের কলিকাতায় গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। মধুস্থদন পাঠ্যাবস্থায়ই খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য', 'পদ্মাবতী নাটক' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অমিত্রাক্ষর ছন্দ, সনেট প্রভৃতি অনেক নূতন সাহিত্য-রীতি সৃষ্টি করিয়া বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার তিনিই প্রবর্তন করিয়াছিলেন।]

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে,—
"শুন মোর কথা, ধনি! নিন্দ বিধাতারে।
নিদারুণ তিনি অতি নাহি দয়া তব প্রতি
তেঁই ক্ষুদ্র কায়া করি সৃজিলা তোমারে!
মলয় বহিলে হায়! নতশিরা তুমি তায়,
মধুকর-ভারে তুমি পড় লো হেলিয়া।
হিমাদ্রি-সদৃশ আমি, বন-বৃক্ষ-কুল স্বামী
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া।
কালাগ্নির মত তপ্ত তপন-তাপন,
আমি কি লো ডরাই কখন?

দূরে রাখি গাভীদলে রাখাল আমার তলে
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ,—
শুন, ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র পালন।
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথগামী জন।
কেহ অন্ন রাঁধি খায়, কেহ পড়ি নিদ্রা যায়
এ রাজ-চরণে।

শীতলিয়া মোর ডরে সদা আসি সেবা করে
মোর অতিথিরে হেথা আপনি পবন।
মধুমাখা ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে।
তুমি কি তা জান না ললনে!

দেখ মোর শাখা-রাশি, কত পাখি বাঁধে আসি
বাসা এ আগারে!
ধন্য মোর জনম সংসারে

কিন্তু তব দুঃখ দেখি নিত্য আমি দুখী;
নিন্দ বিধাতায় তুমি, নিন্দ, বিধুমুখি!

নিরবিলা তরুরাজ, উড়িল গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘ গম্ভীর স্বননে;

আইলেন প্রভঞ্জন, সিংহনাদ করি ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব সমরে।

মহাঘাতে মড়মড়ি রসাল ভূতলে পড়ি,
হায় বায়ুবলে
হারাইল আয়ু-সহ দর্প বনস্থলে।
উচ্চশির যদি তুমি কুল-মান-ধনে,
করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে।

রসাল ও স্বর্ণলতিকা

অনুশীলনী

১। এই কবিতা থেকে কি উপদেশ পেলে ?
২। রসাল স্বর্ণলতিকাকে কি কি বলল ? নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।
৩। ব্যাখ্যা কর—(ক) "যথা ভীম ভীমসেন কৌরব সমরে।"
(খ) "শুন, ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র পালন।"
৪। অর্থ লিখ—স্বর্ণলতিকা, মধুকর, কালাগ্নি, আগার, ললনে।
৫। বাক্য রচনা কর—ক্ষুদ্র-কায়া, নতশির, ডরাই, ভূতলে, নীচ-শির।
৬। শূন্যস্থান পূরণ কর—(ক) মেঘ — উঠে — আকাশ — ! (খ) যথা — ভীমসেন কৌরব —। (গ) করিও না — তবু — জনে।

বিষয় - রসাল বৃক্ষের অহংকার - পূর্ণ উক্তি স্বর্ণ-লতিকার প্রতি। তার সব কৃতিত্ব সেই মুহূর্তে হয়ে গেল প্রবল ঝড়ের আঘাতে ভূমিতে পতিত হওয়ায়।

মূল্যায়ন - সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হলেও নিম্নশ্রেণী প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন ও অহংকার-প্রকাশ করা অনুচিত - এই শিক্ষা প্রকাশিত।



জীবন-সঙ্গীত

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[**লেখক পরিচিতি**—হুগলী জেলার গুলিটা গ্রামে ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তিনি বি.এ , বি. এল. পাস করিয়া মুন্সেফ এবং পরে হাইকোর্টের উকিল হন। সে যুগের কবিদিগের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার রচিত 'বৃত্র-সংহার', 'আশাকানন', 'কবিতাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থ বিখ্যাত। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।]

বলো না কাতর স্বরে   বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন,
দারা পুত্র পরিবার,   তুমি কার, কে তোমার—
বলে জীব করো না ক্রন্দন।

মানব জনম সার   এমন পাবে না আর,
বাহ্যদৃশ্যে ভুলো না রে মন ;
কর যত্ন হবে জয়,   জীবাত্মা অনিত্য নয়,
ওহে জীব কর আকিঞ্চন।

জীবন-সঙ্গীত

করো না সুখের আশ পরো না দুখের ফাঁস
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয় ;
সংসারে সংসারী সাজ করো নিত্য নিজ কাজ,
ভবের উন্নতি যাতে হয়।

দিন যায় ক্ষণ যায় সময় কাহারো নয়,
বেগে ধায়, নাহি রহে স্থির,—
সহায় সম্পদ বল, সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ু যেন শৈবালের নীর !

সংসার-সমরাঙ্গণে যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে
ভয়ে ভীত হয়ো না মানব !
কর যুদ্ধ বীর্যবান, যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
মহিমাই জগতে দুর্লভ।

মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়।

সময়-সাগর-তীরে পদাঙ্ক অঙ্কিত করে
আমরাও হব হে অমর ;
সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে অন্য কোন জন পরে,
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।

অনুশীলনী

১। জীবনের আদর্শ কেমন হওয়া উচিত নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

২। ব্যাখ্যা কর—

(ক) "সংসারে সংসারী সাজ······ভবের উন্নতি যাতে হয়।"

"মহাজ্ঞানী মহাজন······আমরাও হব বরণীয়।"

৩। অর্থ লিখ—বাহ্যদৃশ্য, আকিঞ্চন, জীবাত্মা, শৈবাল, পদাঙ্ক।

৪। পদ নির্ণয় কর—বাহ্যদৃশ্য, আকিঞ্চন, দুর্লভ, ফাঁস, সত্বর।

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর—

— মহাজন, যে পথে — গমন হয়েছেন —,

সেই পথ — করে স্বীয় — ধ্বজা ধরে আমরাও হব —।

বিষয় — আশাবাদী কবি সকল নৈরাশ্য বর্জন করে জীবনকে সাধনা শক্তি দ্বারা ধন্য ও সংগ্রাম সার্থক হতে ও মহাজ্ঞানী মহাজনদের আদর্শ পথ অনুসরণ করতে উপদেশ দিয়েছেন।

মূলভাব — আশাবাদী হওয়ার আদর্শে জীবনকে সার্থক সুন্দর করার প্রেরণা দেওয়া হয়েছে।



—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি
পূজার সময় এলো কাছে।
মধু, বিধু দুই ভাই ছুটাছুটি করে তাই,
আনন্দে দু হাত তুলে নাচে।
পিতা বসি ছিল দ্বারে দুজনে শুধালো তারে,
"কী পোষাক আনিয়াছ কিনে।"
পিতা কহে, "আছে আছে তোমার মায়ের কাছে,
দেখিতে পাইবি ঠিক দিনে।"
সবুর সহে না আর, জননীরে বার বার
কহে, "মা গো, ধরি তোর পায়ে,
বাবা আমাদের তরে কী কিনে এনেছে ঘরে
একবার দে-না মা, দেখায়ে।"
ব্যস্ত দেখি হাসিয়া মা দুখানি ছিটের জামা
দেখাইল করিয়া আদর।
মধু কহে, "আর নেই?" মা, কহিল "আছে এই
একজোড়া ধুতি ও চাদর।"
রাগিয়া আগুন ছেলে, কাপড় ধূলায় ফেলে
কাঁদিয়া কহিল, "চাহি না মা—
রায়বাবুদের গুপি পেয়েছে জরির টুপি,
ফুলকাটা সাটিনের জামা।"

মা কহিল, "মধু, ছি ছি, কেন কাঁদ মিছামিছি,
গরীব যে তোমাদের বাপ।
এবার হয় নি ধান, কত গেছে লোকসান,
পেয়েছেন কত দুঃখতাপ।
তবু দেখো বহু ক্লেশে তোমাদের ভালোবেসে
সাধ্যমতো এনেছেন কিনে—
সে জিনিস অনাদরে ফেলিলে ধূলির 'পরে
এই শিক্ষা হল এতদিনে।"
বিধু বলে, "এ কাপড় পছন্দ হয়েছে মোর,
এই জামা পরাও আমারে।"
মধু শুনে আরো রেগে, ঘর ছেড়ে দ্রুতবেগে
গেল রায়বাবুদের দ্বারে।
সেথা মেলা লোক জড়ো রায়বাবু ব্যস্ত বড়ো,
দালান সাজাতে গেছে রাত।
মধু যবে এক কোণে দাঁড়াইল ম্লান মনে
চোখে তাঁর পড়িল হঠাৎ।
কাছে ডাকি স্নেহভরে কহেন করুণ স্বরে
তারে দুই বাহুতে বাঁধিয়া,
"কী রে মধু, হয়েছে কি, তোরে যে শুকনো দেখি।"
শুনি মধু উঠিল কাঁদিয়া,
কহিল, "আমার তরে বাবা আনিয়াছে ঘরে
শুধু এক ছিটের কাপড়।"
শুনি রায় মহাশয় হাসিয়া মধুরে কয়,
"সেজন্য ভাবনা কেন তোর।"
ছেলেরে ডাকিয়া চুপি কহিলেন, "ওরে গুপি
তোর জামা দে তুই মধুরে।"

গুপির সে জামা পেয়ে মধু ঘরে যায় ধেয়ে,
হাসি আর মুখে নাহি ধরে।
বুক ফুলাইয়া চলে সবারে ডাকিয়া বলে,
"দেখো কাকা, দেখো চেয়ে মামা,
ঐ আমাদের বিধু ছিট পরিয়াছে শুধু,
মোর গায়ে সাটিনের জামা।"
মা শুনি কহেন আসি লাজে অশ্রুজলে ভাসি
কপালে করিয়া করাঘাত,
"হই দুঃখী হই দীন কাহারো রাখি না ঋণ,
কারো কাছে পাতি নাই হাত।
তুমি আমাদেরি ছেলে ভিক্ষা লয়ে অবহেলে
অহংকার কর ধেয়ে ধেয়ে !
ছেঁড়া ধুতি আপনার ঢের বেশি দাম তার
ভিক্ষা করা সাটিনের চেয়ে।
আয় বিধু আয় বুকে, চুমু খাই চাঁদ মুখে,
তোর সাজ সবচেয়ে ভালো।
দরিদ্র ছেলের দেহে দরিদ্র বাপের স্নেহে
ছিটের জামাটি করে আলো।"

অনুশীলনী

১। পূজার সময় কিরূপ আনন্দ হয় ?
২। "ছিটের জামাটি করে আলো"—কেন ? বুঝিয়ে বল।
৩। ব্যাখ্যা লিখ—"মা শুনি কহেন……পাতি নাই হাত।"
৪। পদ পরিবর্তন কর—আদর, আনন্দ, পছন্দ, ব্যস্ত, অহংকার।
৫। শূন্যস্থান পূরণ কর—
শুনি —— হাসিয়া কয়, —— ভাবনা কেন ——।

বিষয়: — বিধু ও মধু — দরিদ্র বিত্তবান সন্তান। বিধু দরিদ্র



আমার দেশ



[**লেখক পরিচিতি**—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে এম. এ. পাস করিয়া বিলাতে যান। ফিরিয়া আসিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। জাতীয় সঙ্গীত ও নাটক রচনায় ইনি সুপ্রসিদ্ধ। ১৯১৩ সালের ১৭ই মে তাঁহার মৃত্যু হয়।]

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ!
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ,
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ,
সপ্ত কোটি সন্তান যার গাহে উচ্চে—"আমার দেশ!"
উদিল সেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ দ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্ধ জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে তাঁর।

অশোক যাঁহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি শেষ,
তুই কি না মাগো তাদের জননী, তুই কি না মাগো তাদের দেশ।
একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময় ;
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কি না এই ধূলায় আসন, তার কি না এই ছিন্ন বেশ !
উদিল যেখানে মুরজ মন্দ্রে নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডীদাস গাহিল গান।
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য, তুই ত' মা সেই ধন্য দেশ !
ধন্য আমরা এ শিরায় যদি বহে মা তাঁদের রক্ত লেশ।
যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘেরি আছে আজি আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাট তোর।
আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা নহি ত মেষ !
দেবি আমার ! সাধনা আমার ! স্বর্গ আমার ! আমার দেশ !

অনুশীলনী

১। এখানে "জননী আমার, ধাত্রী আমার" এবং "আমার দেশ" কথাটি বলা হয়েছে কেন ?

২। টীকা লেখ—বুদ্ধ-আত্মা, বিজয় সেনানী, নিমাই, রঘুমণি, চণ্ডীদাস।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা লেখ—"ধন্য আমরা……রক্তের লেশ।"

৪। পদ নির্ণয় কর—রুক্ষ, সেনানী, উপনিবেশ, উদিল, দিব্য, সাধনা।

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর—

—— যাহার —— ছাইল —— হ'তে জলধি শেষ,
তুই কি না —— তাদের ——, তুই কি না —— তাদের ——



সুখ

—কামিনী রায়

[**লেখক পরিচিতি**—১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দের ১২ই অক্টোবর কামিনী রায়ের জন্ম হয়। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে বি. এ. পাস করিয়া কবি বেথুন স্কুলে শিক্ষিকা হন। ইনি বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি জগত্তারিণী স্বর্ণ-পদক পুরস্কার পান। 'আলোছায়া', 'নির্মাল্য', 'দীপ ও ধূপ', 'জীবনপথে' প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য কাব্য। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।]

কার্যক্ষেত্র ঐ প্রশস্ত পড়িয়া
সমর-অঙ্গন সংসার এই ;
যাও বীরবেশে কর গিয়া রণ ;
যে জিনিবে সুখ লভিবে সেই।

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও ;
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও

পরের কারণে মরণেও সুখ,
'সুখ', 'সুখ', করি কেঁদ না আর
যতই কাঁদিবে ততই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।

সকলের মুখ হাসি-ভরা দেখে
পার না মুছিতে নয়ন-ধার,
পরহিতব্রতে পার না রাখিতে
চাপিয়া আপন বিষাদভার ?

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

অনুশীলনী

১। সুখলাভের জন্য কবি কি উপদেশ দিয়াছেন ?
২। ব্যাখ্যা কর—"কার্যক্ষেত্র ঐ· ···লভিবে সেই "
৩। অর্থ লিখ—সময়-অঙ্গন, হৃদয়-ভার, অবনী।
৪। পদ নির্ণয় কর—বীরবেশে, কাঁদিবে, হাসিভরা, বিষাদ, তরে।
৫। শূন্যস্থান পূরণ কর—
—কারণে—সুখ,
— —করি কেঁদ না আর
যতই—ততই—
ততই বাড়িবে— —।



সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ছেলের দল

[লেখক-পরিচিতি—১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম হয়। পিতার নাম রজনীনাথ দত্ত। তিনি বি.এ. পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে জুন তাহার মৃত্যু হয়।]

হল্লা ক'রে ছুটির পরে ওই যে যারা যাচ্ছে পথে,
হাল্কা হাসি হাসছে কেবল,—ভাসছে যেন আলগা স্রোতে—
কেউ বা শিষ্ট, কেউ বা চপল, কেউ বা উগ্র, কেউ বা মিঠে, ;
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—ভাবনা যা, সে' ওদের পিঠে।
ওই আমাদের চোখের মণি, ওই আমাদের বুকের বল,—
ওই আমাদের অমর প্রদীপ, ওই আমাদের আশার স্থল,—
ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পুণ্যফল,—
আদর্শে যে সত্য মানে—সে ওই মোদের ছেলের দল।

ওরাই ভালোবাসতে জানে
দরদ দিয়ে সরল প্রাণে,

প্রাণের হাসি হাসতে জানে, খুলতে জানে মনের কল,
ওই যে দুষ্টু, ওই যে চপল—ওই আমাদের ছেলের দল।

*　　　*　　　*　　　*

মানুষ হ'য়ে ওরা সবাই অমানুষী শক্তি ধরে,
যুগের আগে এগিয়ে চলে, হাস্যমুখে গর্বভরে,
প্রয়োজনের ওজন-মত আয়োজন সে করতে পারে,
ভগবানের আশীর্বাদে বইতে পারে সকল ভারে
ওই আমাদের ছেলেরা সব—ত্রুটি ওদের অনেক হয়,—
মাঝে মাঝে ভুল ঘটে ঢের,—কারণ ওরা দেবতা নয় ;
মাঝে মাঝে দাঁড়ায় বেঁকে নিন্দা শুনে অনর্গল,
প্রশংসাতেও হয় গো কাবু—মনের মতন দেয় না ফল ;
তবু ওরাই আশার খনি—
সবার আগে ওদের গনি,
পদ্মকোষের বজ্রমণি ওরাই ধ্রুব সুমঙ্গল
আলাদিনের মায়ার প্রদীপ ওই আমাদের ছেলের দল।

অনুশীলনী

১। "ওই আমাদের আশার স্থল।"—কেন ?
২। কবি ছেলের দলকে "আলাদিনের মায়ার প্রদীপ" বলিয়াছেন কেন ?
৩। ব্যাখ্যা কর—"পদ্মকোষের বজ্রমণি ওরাই ধ্রুব সুমঙ্গল।"
৪। "আদর্শে যে সত্য মানে"—কে ? বর্ণনা দাও।
৫। পদ নির্ণয় কর—ছুটির, পরে, মোদের, আগে, আশীর্বাদ।

বিষয় – শিশুদের শক্তির [illegible] আমাদের [illegible]
প্রকাশ [illegible]।
মূলভাব – শিশুদের সুপ্ত শক্তি দেশের [illegible]
[illegible]
— [illegible]।

ঘুড়ি ও প্রজাপতি

—কবিশেখর কালিদাস রায়

[**লেখক-পরিচিতি**—১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের ৯ই জুলাই শ্রীকালিদাস রায়ের জন্ম হয়। নিবাস বর্ধমানের কড়ুই গ্রামে। বি.এ. পাশ করিয়া শিক্ষকতা কর্মে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত কাব্য-গ্রন্থ—'কিশলয়', 'পর্ণপটু,' 'বল্লভী' 'রসকদম্ব,' 'গাথাঞ্জলী' প্রভৃতি গ্রন্থ বিখ্যাত। 'বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়,' 'শরৎ সাহিত্য,' 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য' ইহার রচিত সমালোচনা গ্রন্থ।]

ঘুড়ি ডেকে কয়, "ওরে প্রজাপতি যোজন খানেক তলে
রোস তুই, তবু দেখি তোরে শুধু দিব্য দৃষ্টি-বলে।
আচ্ছা বল্ ত—গ্রহমণ্ডলে চলাফেরা দেখে মোর,
অবাক হয়ে কি রোস্ না ক' চেয়ে, হিংসে হয় না তোর?"
প্রজাপতি কয়, "মর, কি বুদ্ধি কাগুজে চিড়িয়া ঘুড়ি,
আমি কেন তোরে হিংসে করব, মধু খেয়ে খেয়ে উড়ি।
তুই ত বন্দী, কর না বড়াই যতই উপর থেকে।
স্বাধীন কখন হিংসে করে কি গোলামের তেজ দেখে?"

অনুশীলনী

১। ঘুড়ি ও প্রজাপতির কথার মধ্যে পার্থক্য কি?

২। প্রজাপতির উত্তরটি ঠিক হইয়াছে কি? যুক্তি দেখাও।

৩। ব্যাখ্যা লিখ—

"স্বাধীন কখন হিংসে করে কি গোলামের তেজ দেখে?"

৪। পদ নির্ণয় কর—

প্রজাপতি, অবাক, চিড়িয়া, হিংসে, বন্দী।

৫। টীকা লিখ—

গ্রহমণ্ডল, কাগুজে, মধু, স্বাধীন।



—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

[**লেখক-পরিচিতি**—১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। নদীয়া শান্তিপুরে নিবাস। ইনি বি.এ. পর্যন্ত পড়েন। স্কুলে শিক্ষকতা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসসমূহের পরিদর্শকরূপে কাজ করেন। তাঁহার রচিতগ্রন্থ 'ঝরাফুল,' 'বঙ্গমঙ্গল,' 'প্রসাদী,' 'ধানদূর্বা,' 'শান্তিজল,' 'রবীন্দ্র আরতি' প্রভৃতি। ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার মৃত্যু হয়।]

গ্রামে ঢোকে জল, গাঙে নামে ঢল,
আকাশের কোলে কোমল কাজল,
এসেছে বরষা বড় চঞ্চল
বড় দুরন্ত মেয়ে।
ডুবে গেছে মাঠ, গঞ্জের ঘাট,
অশথের তলে বসে না'ক হাট'
সারা দিনরাত বৃষ্টির ছাট
ঝরিতেছে একঘেয়ে॥
ভাসিল পুকুর, আউসের ভূঁই,
পালায় কাত্‌লা কালবোস রুই,
আঙ্গিনায় জল করে ছল ছল,
কই যায় কানে হেঁটে।
কাঁঠালিচাঁপার তীব্র সুবাস
মাতাল করেছে বাদল বাতাস ;
গাছভরা জাম সুচিকণ শ্যাম
রসে পড়ে যেন ফেটে॥

ভিজে ভিজে নীড় বুনিছে বাবুই,
ঝাপটে ঝটিকা ছুটিয়ে হাউই—
চ'লে গেছে চিল, গগনের নীল
গ'লে গেছে জল-ধারে।
রাঙা আঁখি মেলি আনারস-রাজ
পরিয়াছে শিরে মরকত-তাজ ;
নেবুর কুঞ্জে মধুর গন্ধ
চন্দন-দীঘি-পারে॥

অনুশীলনী

১। নিজের ভাষায় বর্ষার একটি বর্ণনা লিখ।

২। ব্যাখ্যা কর—

(ক) "গগনের নীল গ'লে গেছে জল-ধারে।"

(১) "রাঙা আঁখি মেলি······মরকত তাজ।"

বাক্য রচনা কর—

গাঙ, গঞ্জ, আউশ, আঙ্গিনা, নীড়।

৪। "বড় চঞ্চল দুরন্ত মেয়ে"—কে ? বর্ণনা দাও।

৫। পদ নির্ণয় কর—

দুরন্ত, চঞ্চল, গঞ্জের, একঘেয়ে, জল-ধারে।

বিষয়— : প্রাকৃতিক বর্ষা চিত্রাবলি।
মূল্যায়ন :- প্রকৃতি-সচেতন করে তোলা।



সংকল্প

—কাজী নজরুল ইসলাম

[**লেখক পরিচিতি**—জন্ম ২৪ মে, ১৮৯৯। বর্ধমান জেলার চুরুলিয়ায় নিবাস। স্কুলের শিক্ষা শেষ হইবার আগেই নজরুল সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে করাচি হইতে ফিরিয়া কবি পুরাপুরি কাব্যচর্চাতেই মনোনিবেশ করেন। 'অগ্নিবীণা,' 'বিষের বাঁশী,' 'দোলনচাঁপা,' 'সিন্ধুহিল্লোল,' 'ছায়ানট' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।]

থাকব না'ক বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে
কেমন ক'রে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হ'তে সে দেশান্তরে
ছুটছে ঝড়ে কেমন ক'রে!
কিসের নেশায় কেমন ক'রে মরছে যে বীর লাখে লাখে,
কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে
কেমন করে বীর ডুবুরী সিন্ধু সেচে মুক্তা আনে,
কেমন করে দুঃসাহসী চলছে উড়ে স্বর্গপানে!
জাপ্‌টে ধ'রে ঢেউয়ের ঝুটি
যুদ্ধ-জাহাজ চল্‌ছে ছুটি,

কেমন ক'রে আনছে মাণিক বোঝাই ক'রে সিন্ধু-যানে,
কেমন জোরে টানলে সাগর উথ্‌লে ওঠে জোয়ার বানে।
কেমন ক'রে মথলে পাথার লক্ষ্মী ওঠেন পাতাল ফুঁড়ে,
কিসের অভিযানে মানুষ চলছে হিমালয়ের চূড়ে।
তুহিন-মেরু পার হ'য়ে যায়
সন্ধানীরা কিসের আশায় ;
হাউই চ'ড়ে চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিন্ পুরে,
শুনব আমি ইঙ্গিত কোন মঙ্গল হ'তে আসছে উড়ে !
রইব না'ক বদ্ধ খাঁচায়, দেখব এসব ভুবন ঘুরে,
আকাশ বাতাস চন্দ্র তারায় সাগর-জলে পাহাড় চূড়ে
আমার সীমার বাঁধন টুটে,'
দশদিকেতে পড়ব লুটে,
পাতাল ফেরে নাম্‌ব নীচে, উঠব আমি আকাশ ফুঁড়ে
বিশ্ব-জগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে।

অনুশীলনী

১। কবির ভাষায় 'সঙ্কল্প' কি কি ? নিজের ভাষায় বল।

২। অর্থ লিখ—
ঘূর্ণিপাক, সিন্ধুযান, অভিযান, তুহিন-মেরু, সীমার বাঁধন।

৩। ব্যাখ্যা লিখ—
"পাতাল ফেড়ে নামব……হাতের মুঠোয় পুরে'।

৪। বাক্য রচনা কর—
আশায়, নেশায়, মাণিক, ফুঁড়ে, ভুবন।

— —

বিষয় : [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]